বিচিত্র এ দেশ

প্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রী প্রকাশ ভবন । কলিকাতা-১২

পুনর্মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ
১৩৬৭

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক
সুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

বিচিত্র এ দেশ

চলো যাই হিমালয়ে

হিমালয় পর্বত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিরাট আর উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। এর বিস্তার এত বেশী যে, আজও এর নির্ভুল পরিমাপ নির্ণয় করা যায়নি।

কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্তে হিন্দুকুশ থেকে আরম্ভ ক'রে আসামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হিমালয়ের বিস্তার ধ'রে নেওয়া যায়। লম্বায় দুই হাজার মাইলের কম নয়, চওড়ায়—কেউ কেউ ধ'রে নেন, ছয়শো-সাতশো মাইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি অংশ, কাশ্মীর, পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, নেপাল, বাংলা, আসাম ও বর্মার ঈষৎ পশ্চিমাংশ—এতগুলি দেশ এবং প্রদেশ জুড়ে রয়েছে নগরাজ হিমালয়। এই বিরাট পর্বতশ্রেণীর আড়ালে রয়েছে কত অসংখ্য জাতি, কত ধর্মমতের লোক, কত রকমের ভাষাভাষী এবং কত প্রকার আচার ও রীতিনীতি-যুক্ত সমাজ! যে সকল অঞ্চল সাধারণ লোকের পক্ষে অগম্য, সেখানেও দেখা যাবে শত-সহস্র পার্বত্য বসতি,—ছোট ছোট লোকালয়। এরই মধ্যে রয়েছে নাম-না-জানা শত-সহস্র ছোট-বড় নদী, লক্ষ লক্ষ ঝরণা ও জলপ্রপাত, কত অগণ্য বন-উপবন-তপোবন, কত গুহাগহ্বর!

সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখতে পাওয়া যায় হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে,—তাঁরা লোক-সমাগমের মধ্যে আসেন না, আধুনিক সভ্যতার কোন ধারই ধারেন না তাঁরা। এঁদের কেউবা কাশ্মীরী হিন্দু, কেউবা শিখ অথবা পঞ্জাবী হিন্দু, কেউ আবার নেপালী, তিব্বতী অথবা ভুটিয়া, কেউ কেউ হিন্দুস্থানী, অথবা বিহারী, অথবা বাঙালী, কোন কোন

সন্ন্যাসী আবার দাক্ষিণাত্যের লোক। বেশ বুঝতে পারা যায়, শত-সহস্র বছর ধ'রে লক্ষ লক্ষ হিন্দু এবং হিন্দুস্থানবাসী হিমালয়ের সঙ্গে নিজেদের বংশ-পরম্পরাকে জড়িয়ে রেখেছে।

হিমালয়ের বিশাল পার্বত্য-লোক সকল সময়েই জন-কোলাহলে মুখর। সেখানে চাষবাস আছে, গ্রাম আছে, কুটীর-শিল্প আছে, এমন কি ইদানীং অনেক দুর্গম অঞ্চলে ছোটখাটো শহরও দেখা যায়। পঞ্জাবে যেমন ল্যান্সডাউন, ডালহাউসী, মারী, সানি ব্যাঙ্ক, সোলন, ধরমপুর, শিমলা ইত্যাদি; উত্তর প্রদেশে যেমন আলমোড়া, নৈনীতাল, রাণীক্ষেত, দ্বারীহাট, ভিকিয়াসেন, কোটদ্বার ইত্যাদি ; বাংলায় যেমন দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং। এ ছাড়াও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে অনেকগুলি গ্রাম ও শহর আধুনিক যুগে গ'ড়ে উঠেছে ; এই সব ছোট ছোট বসতি ও ছোটখাটো শহরে প্রধানত হিন্দু সভ্যতারই নানাবিধ চিহ্ন দেখা যায়। আবার, পূর্ব হিমালয়ে যেমন বৌদ্ধযুগের অনেক রকম স্থাপত্য ও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি পশ্চিম ও উত্তর হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই শঙ্করাচার্যের কীর্তিকলাপ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। এখানকার অন্দরে-কন্দরে শৈবধর্মের বিরাট প্রসার ও প্রচার দৃষ্টিগোচর হয়। পুরাকালে নির্মিত শত-সহস্র মঠ-মন্দির আজো হিমালয়ের সবত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঋষিকুল, গুরুকুল, নিরঞ্জনী মঠ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকেই এই সমস্ত মঠ-মন্দির ও সন্ন্যাসীদের আখড়া পরিচালিত হয়ে থাকে। যুগ-যুগান্তর ধ'রে এইভাবেই হিন্দুর ধর্মপ্রাণতা তার সাক্ষ্য রেখে এসেছে হিমালয়ের বুকে।

বাংলার কাছাকাছি হিমালয়ের যে অংশটুকু পাই, এখন তার কথা একটু বলি। তোমাদের অনেকেই হয়ত দার্জিলিং গেছ। এবার চলো, দার্জিলিং-এর বাইরে একবারটি তোমাদের নিয়ে যাই। মাঝরাত্রে চ'লে এসো আমার সঙ্গে—পিছনে ঘুমিয়ে থাক্ দার্জিলিং আশ্বিনের

শেষের ঠাণ্ডায় লেপমুড়ি দিয়ে। তারপর চলো আমরা চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে কার্সিয়াং-এর দিকে যাই। ঘুম্-এ এসে দাঁড়াও। ঘুম্ তখন ঘুমে ভরা। বড্ড শীত। চলো ওই বাঁ-দিকের রাস্তা ধ'রে উঁচু চড়াই পথে। ছায়া-ঝিলিমিলি শেষরাত্রের মধুর জ্যোৎস্না। দীর্ঘকায় প্রহরীর মতো বড় বড় চিড়গাছ ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের পথের পাশে। পথ ঘুরে ঘুরে গিয়েছে উপর দিকে। মাইল দেড়েক পথ,—বাঁ-দিকে অদূরে সেন্‌চলের বড় জলাশয়,—আমরা ডান-পথ ঘুরে এঁকেবেঁকে চলেছি। রাত সাড়ে তিনটে বেজেছে। প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে এসেছি—নীচেকার পৃথিবী শূন্য, অদৃশ্য,—অনন্ত আকাশ—নিঝুম,—শব্দ-জগৎ নিঃসাড়!

একবার চেয়ে দেখো 'টাইগার হিল্' থেকে নীচের দিকে! শত শত মাইলব্যাপী তিস্তা উপত্যকা পূব-জগতের দিকে প্রসারিত—কিন্তু অস্পষ্ট। চেয়ে থাকো আকাশ আর পৃথিবীর সীমারেখায়, চেয়ে থাকো অনেকক্ষণ একদৃষ্টে,—চোখের পলক যেন না পড়ে! ওই দেখো, হঠাৎ পৃথিবী চৌচির হোলো,—ভলকে ভলকে ফেনিয়ে উঠছে লাল নীল বেগুনি রক্ত,—সেই রক্তে স্নান ক'রে সহসা লাফ দিয়ে উঠলো একটি ছোট্ট জবাকুসুম,—চেনো ওকে? ওই তো শিশুসূর্য। এখন কেমন দেখাচ্ছে ওকে? ঠিক যেন ছোট্ট একটি তামার পিণ্ড,—উজ্জ্বলন্ত, দীপ্ত, তেজোগর্ভ! পিছনে চেয়ে দেখো—কাঞ্চনজঙ্ঘার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, আর গৌরীশৃঙ্গের তুষারের জটা সিন্দুরের লালে বন্যা এনেছে! পৃথিবীর আর কোথাও এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। এর পরমাশ্চর্য মহিমা মিশে রয়েছে বিশাল হিমালয়ের সঙ্গে।

হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে সভ্য মানুষের আনাগোনা এখনও অনেক কম। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলেই লুকিয়ে আছে হিমালয়ের অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য। সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে সমুদ্রের শোভা উপভোগ করা যায়

বটে, কিন্তু সমুদ্রের আসল রূপ বুঝতে গেলে সমুদ্রযাত্রার দরকার। তেমনি দার্জিলিং, কার্সিয়াং অথবা কালিম্পং দেখে হিমালয়ের আসল রূপ জানা যায় না। তাকে জানতে গেলে প্রবেশ করতে হবে তার পর্বত-শ্রেণীর এই দুর্গম অন্দর মহলে।

কালিম্পং-এর কথায় মনে পড়ে গেল আমার একবারকার অভিজ্ঞতার কথা। তখন বৈশাখের শেষ। চলেছি আমরা কালিম্পং-এর উদ্দেশে। শিলিগুড়ি থেকে ছোট্ট রেলগাড়ী চ'ড়ে আমরা গেলিখোলা গেলুম, সেখান থেকে মোটরে কালিম্পং। মাঝপথে তিস্তা নদীর ছোট্ট পাথর-বাঁধানো সাঁকোর উপরে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের আশ্চর্য রূপের দিকে তাকিয়ে লছমনঝুলার দৃশ্য মনে প'ড়ে গেল; মনে প'ড়ে গেল উত্তরধামে যোশীমঠের পথ ধ'রে বিষ্ণুগঙ্গার উদ্দেশ্যে আমার যাত্রার কথা। শোনা যায়, এই তিস্তা নদী পেরিয়ে একদা রাজা রামমোহন তিব্বতের অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। তিব্বতের পথ যে এখান থেকেই অনেকটা প্রশস্ত হ'তে আরম্ভ করেছে।

সেদিনটা ছিলো পঁচিশে বৈশাখ,—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি। রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পং-এ গৌরীপুর-রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। তাঁর কাছেই আমরা যাচ্ছিলাম কিছু উপহার-সামগ্রী নিয়ে। বলা বাহুল্য, হিমালয়ের আসনে তাঁকে মানিয়েছে ভালো। তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে কালিম্পং ভ্রমণ সেদিন আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে থাক্।

এখন চল, নেপালে যাওয়া যাক্,—দেখবে হিমালয়ের সেই একই অনির্বচনীয় দৃশ্য! রক্সৌল থেকে আমলেকগঞ্জ, সেখান থেকে ভীমপেডি, তারপর কুলেখানি আর চেৎলাং,—সেই একই রকম দুরারোহ পার্বত্য পথ। কাটমাণ্ডু যেতে হ'লে শ্রীশগিরি, বাগমতী নদী এবং চন্দ্রগিরি অতিক্রম করতে হবে। চন্দ্রগিরির চূড়া থেকে নীচের

দিকে ছবির মতো থানকোট এবং কাটমাণ্ডু শহরটি দেখে অভিভূত হ'তে হয়। পশুপতিনাথ তীর্থ কাটমাণ্ডু থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে। রাজ-প্রাসাদের কোল ঘেঁসে তার পথ। সেখানে প্রতি বছর শিবরাত্রির মেলা বসে। স্বয়ং মহারাজা এসে সেই উৎসব পালন করেন।

যেমন আসামের প্রান্ত, তেমনি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের পথ দিয়ে হিমালয়ের অভিমুখে যাওয়া যায়। তারপর নৈনিতাল, আলমোড়া, রামনগর, কোটদ্বার ইত্যাদি পার্বত্য শহরগুলিও হিমালয়ের অন্তর্গত বলা যায়। উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে হিমালয়ের যোগ অনেকটা অবিচ্ছিন্ন বলা চলে। গাড়োয়াল জেলা, কুমায়ুন, হরিদ্বার,—এরা হিমালয়ের সঙ্গেই যুক্ত। যারা তিব্বতে, অর্থাৎ উত্তরকাশী, কিম্বা যোশীমঠ, অথবা কৈলাস ও মানস-সরোবর, কিম্বা গঙ্গোত্রী ও গোমুখী যেতে চায়,—তাদের পক্ষে এই পথটি প্রশস্ত। তিব্বতের সীমানা এখান থেকে বেশী দূর নয় বটে, কিন্তু কৈলাস ও মানস-সরোবর পৌঁছবার আগে দুর্গম ও দুরারোহ পার্বত্যভূমি অতিক্রম করতে হয়। যারা শক্তিমান ও কষ্টসহিষ্ণু, অসাম ধৈর্যের সঙ্গে প্রবল দুঃসাহস নিয়ে যারা এগিয়ে যেতে পারে,—গিরিরাজ হিমালয় তাদের কাছে ধরা দেন। ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলের বন্ধু তিনি নন্।

এগিয়ে চলো আমার সঙ্গে পঞ্জাবের দিকে। সমগ্র পঞ্চনদ হোলো ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। লাহোর থেকে রাওয়ালপিণ্ডির পথে পথে পাবে অনুর্বর ধূসর পার্বত্যভূমি। এই পথ ধ'রে এসেছিল গ্রীক, এসেছে পাঠান, এসেছে তাতার দস্যুর দল, এসেছিল মোগল। কত সভ্যতার পদচিহ্ন মুছে গেছে, কত কঙ্কাল চাপা পড়েছে কর্কশ কালো কাঁকর-পাথরের তলায়। একমাত্র ইংরেজ এসেছে ভারতের পিছন দিক দিয়ে জলপথে জলদস্যুর মতন। সেদিন তারা ছিল চতুর, আজ হোলো ফতুর। দিল্লী ছেড়ে আমরা যেতে পারতুম হিমালয়ের

পাদদেশে কাংড়ায়, কিম্বা শিমলার দিকে। কাল্‌কা থেকে যাও সোলন, ধরমপুর,—যাও সোজা শিমলায়। কত সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা সেখানে! সেখানে পাবে তারাদেবী আনানদেল্; সেখান থেকে কিছুদূরে পাতিয়ালার পার্বত্য রাজধানী চাইল্;—আবার এদিকে শিমলায় এসে যাও ছোট-শিমলায়, বয়লুগঞ্জে যাও প্রস্‌পেক্ট পাহাড়ে—সেখানে পাইনের নীচে ছায়া-ঝিলিমিলি মধুর সীমান্তের হাওয়ায় আয়োজন করো বনভোজনের।

রাওয়ালপিণ্ডিতে এসে ট্রেন থেকে নামো। ওখান থেকে মোটরে আমার সঙ্গে চলো কাশ্মীরের পথে। পাহাড়ী পাইন আর চিড়ের অরণ্য: সর্বত্রই অনন্ত শান্তি, কোলাহলের রেশ নেই কোথাও! মোটর চলেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে। সানি ব্যাঙ্ক থেকে চ'লে যাও কোহালার দিকে, আর নয়ত আরো উঁচুতে উঠে এসো মারী পাহাড়ে। ছোট ছোট পাহাড়ী শহর। এখান থেকে দূরে চেয়ে দেখো নাগা পর্বত, তার পাশে সুবিখ্যাত নন্দাদেবী,—ছাব্বিশ হাজার ফুট উঁচু। ওর আশে-পাশে কাশ্মীর। আরো উত্তরে কারাকোরম, হিন্দুকুশ,—বাঁ-দিকে দেখা যাবে ওয়াজিরি আর আফ্রীদীদের পার্বত্য ভূমি। কিন্তু হিমালয় এখানেও শেষ হয়নি।

মারী পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে চেয়ে দেখো—দেখবে অন্তহীন উপত্যকা, আর সমতল হিন্দুস্থান, যেমন টাইগার হিল্-এ দাঁড়িয়ে দেখা যায় তিস্তা উপত্যকা, যেমন চেরাপুঞ্জীতে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সুরমা উপত্যকা। সম্ভবত হিমালয় শেষ হয়েছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ আর আফগানিস্থানের সংযোগে হিন্দুকুশের প্রান্তে।

সেই বলশালী দুঃসাহসী অভিযাত্রী আজো জন্মগ্রহণ করেনি, সমগ্র হিমালয় জয় করার জন্য যে ঘর ছেড়ে বেরোবে। হিমালয়ের অনন্ত ঐশ্বর্য আজো অনাবিষ্কৃত রয়েছে। কত অমূল্য ধাতু ও পাথর, কত

মণিমাণিক্য, কত অগণ্য ওষধিলতা, কত মৃতসঞ্জীবনী কোথায় কিভাবে সঞ্চিত রয়েছে কেউ তা'র সন্ধান জানে না। শীতকালে হিমালয়ের দুর্গম তুষারশীর্ষ থেকে উড়ে আসে রাজহংসের দল—তারা সংবাদ আনে অতুলনীয় সম্পদের ; একদিন আবার তারা উড়ে চ'লে যায় মানস-সরোবরের দিকে।

হিমালয়ের গুহাগহ্বরে যাঁরা সাধনা করেন, তাঁরা মুনিঋষি ; কিন্তু হিমালয়কে জানবার সাধনা যাঁরা করেন, তাঁরা বীরশ্রেষ্ঠ।

কাশ্মীর

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত একদা কতদূর অবধি প্রসারিত ছিল, এই নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে অনেক রকমের আলোচনা আছে। কিন্তু একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান আফগানিস্থান এমন কি, রুশদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলও ভারতের সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান আফগান দেশই হ'ল মহাভারতের আমলের গান্ধার এবং আজও আফগানিস্থানের বহু অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের প্রাচীন মন্দির ও স্তূপ তার সাক্ষ্য দেয়। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, কুরু ও পাণ্ডববংশের প্রথম ধারাটি একদিন সমরখণ্ড ও বখারার পথ ধ'রে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে গান্ধারের ভিতরে এসে প্রবেশ করেছিল, এবং তারা ক্রমশ হিমালয়ের দক্ষিণ পাড় ধ'রে, আধুনিক হিন্দুস্থান পেরিয়ে পূর্বদিকে আসাম-প্রান্ত অবধি অভিযান করেছিল। সুতরাং মোটামুটি বুঝতে পারা যায়, আফগানিস্থান থেকে বর্মা অবধি হিন্দুরাজত্ব বহুকাল ধ'রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও ইতিহাসে দেখা যায় এই সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল এক হাজার বছরের কিছু বেশী, কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্য বিচার করলে আরও অনেককালের চিহ্নই মেলে। মূল মহাভারতে দেখা যায়, আফগানিস্থান থেকে আসাম অবধি সমগ্র উত্তর-সাম্রাজ্য হিন্দুর অধিকারে ছিল। আর্য-প্রাধান্য ছিল ব'লেই এর নাম ছিল আর্যাবর্ত।

কাশ্মীর-রাজ্য এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং রামায়ণ ও মহাভারতে একে বলা হ'ত জম্বুদ্বীপ। প্রায় আড়াই হাজার বছর

আগে থেকে দেখি, কাশ্মীর হ'ল হিন্দুপ্রধান, এবং পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক হ'লেন কাশ্মীরের রাষ্ট্রনায়ক। তারপর কনিষ্ক, মিহিরগুল, প্রবর্শেন এবং ললিতাদিত্য অবধি এক হাজার বছরের অনেক বেশী কাল হিন্দুরা এখানে একপ্রকার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত-সমাজ প্রায় ছয়শো বছর কাশ্মীরে রাজত্ব করার পর চতুর্দশ শতাব্দীর আরম্ভেই পাঠানরা এসে কাশ্মীরকে হিন্দুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। এর পর থেকে সাড়ে-পাঁচশো বছর অবধি পাঠান ও মোগলরা কাশ্মীরে রাজত্ব করে। বুঝতে পারা যায়, এই সাড়ে-পাঁচশো বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীবা ধর্মান্তরিত হয়, এবং বর্তমানের কাশ্মীর হ'ল, মুসলমান-প্রধান একটি হিন্দুরাষ্ট্র। প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মহারাজা গোলাপ সিং কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন।

কাশ্মীরে যাবার প্রধান পথ এখন দু'টি। একটি হ'ল, পাঠানকোট থেকে মোটরযোগে সানি ব্যাঙ্ক, মারী, কোহালা হয়ে ডোমেল ও রামপুরের পথ ধ'রে শ্রীনগর পৌঁছনো; অপর পথটি হ'ল, জম্বু, অনন্তনাগ ও অবন্তীপুরের পথ ধ'রে যাওয়া। এ-ছাড়া আরও শাখা-প্রশাখা পথ আছে, কিন্তু আবটাবাদের পাকা পথটি ছাড়া সেগুলির বেশীর ভাগই হ'ল দুর্গম। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যে চমৎকার মোটর পথটি এঁকে-বেঁকে পাহাড় পেরিয়ে গেছে, সেই পথটি কোহালায় এসে কাশ্মীর-রাষ্ট্রের সীমানায় ঢোকে। জম্বু ও অবন্তীপুরের পথটিও অতি মনোরম। বর্তমানে দিল্লী ও শ্রীনগরের মধ্যে বিমান চলাচল আরম্ভ হয়েছে।

কাশ্মীর-উপত্যকার উচ্চতা কমবেশী পাঁচ হাজার ফুট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্য এমনটি আর সমগ্র ভারতবর্ষে নেই। তুষার-মণ্ডিত পর্বতের সৌন্দর্য, কোমল নীল হ্রদ, মনোরম বীথিকা, অজস্র ফুলের

সম্ভার, শস্য ও সজীর আনন্দলোক,—এদিক থেকে কাশ্মীর অদ্বিতীয়। এ-ছাড়া আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীক, পাঠান ও মোগলগণের স্থাপত্য-শিল্পে কাশ্মীর সুসমৃদ্ধ। কাশ্মীরের কবি ও ঐতিহাসিক কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে পাওয়া যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দুরাজত্বের শেষদিকে উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য-বর্বরজাতি দামারাস ও তান্ত্রীয়রা বার বার কাশ্মীর আক্রমণ করে। তারা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, লোকহত্যা এবং নারীহরণের দ্বারা রাষ্ট্রকে অচল ক'রে দেয়, এবং হিন্দুর বহু স্থাপত্য-কীর্তি ও কারুশিল্প ধ্বংস করে। কহ্লন বলেন,—জনৈক তাতার-যোদ্ধা, জুল্‌ফি কাদির খান, চতুর্দশ শতাব্দীতে কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে প্রায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে ক্রীতদাস স্বরূপ নিয়ে যান, কিন্তু পথিমধ্যে হিম তুষারের গর্ভে তাঁর সঙ্গে বিরাট সেই জনতা বিলীন হ'য়ে যায়। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক তাঁর বইয়ে লিখেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীরের শাহ শিকান্দার বহু প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প ও মন্দির ধ্বংস করেন। সেই ধ্বংসের ভিতর থেকে আজও যেগুলি সেদিনের সাক্ষ্য দেয়, সেগুলি হোলো মার্তণ্ড মন্দির, পুণ্ডরাস্থান, গণেশবল ও ব্রজবিহার ইত্যাদি।

কাশ্মীরকে কেউ বলেন, প্রাচ্যের নন্দন-কানন; কেউ বলেন ভূস্বর্গ। সাধারণভাবে কাশ্মীরের সৌন্দর্য নানাভাবে উপভোগ করা যায়, চৈত্র মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। বাকি সময়টায় শীতের প্রাবল্য থাকার জন্য যাত্রীদের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই উপত্যকায় ফুলের প্লাবন আসে বসন্তকালে এবং ভরাভাদ্রে সমস্ত হ্রদ শতদল-পদ্মে ভ'রে ওঠে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দুরা যেমন দেবতার প্রতিষ্ঠান বেছে নিয়েছে সাগরের বেলাভূমিতে, কিম্বা দুর্গম পর্বতের চূড়ায়, অথবা বিস্তীর্ণ নদীর উপকূলে, অথবা অরণ্য-লোকে, তেমনি কাশ্মীরের হিন্দুরাও মন্দির ও অন্যান্য পাষাণকীর্তি স্থাপনা

করেছে পাহাড়-পর্বত এবং উচ্চ মালভূমির শীর্ষে। সমগ্র কাশ্মীরের সর্বত্রই হিন্দু-সভ্যতার এইসকল কীর্তি মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে সকল বৌদ্ধ-কীর্তি এখনও নষ্ট হয়নি সেগুলিতে গান্ধার-শিল্প-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। বড় বড় স্তূপ, স্তম্ভ, চূড়া, মন্দিরের মুকুট এবং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-মন্দিরের স্থাপত্য—এদের উপরে গ্রীকশিল্প-প্রভাবের বহু চিহ্ন মেলে; কেননা গ্রীক-প্রভাব শত শত বছর ধ'রে কাশ্মীরে পরিব্যাপ্ত ছিল। এর ফলে হয়েছে এই যে, ভারতের অন্যান্য মন্দিরের শিল্প-নীতি ও নির্মাণ-রীতির সঙ্গে এই সকল মন্দিরের মিল নেই।

মোগল-যুগের প্রথম দিকে কাশ্মীরে স্থপতিশিল্প বেশ উৎসাহ পেয়েছিল। শ্রীনগরের কাছে ডাল-হ্রদের চতুঃসীমানায় সম্রাট শাজাহানের চশমাসাহি নামক একটি উদ্যান দেখা যায়। এখানে ঝরণা ও ছোটনদী আছে। এ-ছাড়া নিশাত-বাগ, শালিমার বাগান, নাশিম-বাগ ইত্যাদি মনোরম সৌন্দর্যের নিদর্শনগুলিও মোগল-সম্রাট ও শাসকগণের কীর্তি। এই সবগুলিকে একত্র ধ'রে মোগল-গার্ডেন্‌স বলা হয়।

কিন্তু এ-সবের চেয়ে যা' আমাদের মনে সব চেয়ে বেশী বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগায় তা' হ'ল জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের মন্দিরটি; বিশাল এক পর্বতের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি অসংখ্য রাজা-বাদশা এবং সাম্রাজ্যের পতন ও অভ্যুদয়কে উপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাটের সাক্ষ্যস্বরূপ যুগযুগান্তকাল ধ'রে। শঙ্করাচার্যের এই মন্দিরটি প্রায় বাইশ শত বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। এর নীচে দিয়ে বয়ে যায় চন্দ্রভাগা নদী, দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাঙ্গা পর্বত ও হরমুখ, হরিপর্বত এবং কিছু দূরে রয়েছে ডাল-হ্রদ। হিন্দু-সভ্যতার এই সুবিশাল

কীর্তি কাশ্মীরের সমস্ত স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব আজও বহন করছে।

এত সুন্দর দেশ কাশ্মীর, কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যের বড় অভাব। শহরে, কি গ্রামে—নরনারী কেউই শরীরিক পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না। একজন সাহেব-লেখক বলেন, দু'মাইল দূর থেকে শ্রীনগর শহরের দুর্গন্ধ নাকে আসে। কাশ্মীরবাসীদের নোংরা পরিচ্ছদ, তার চেয়েও নোংরা শরীর—রোগে, অসুস্থতায়, বদ্‌অভ্যাসে, কুসংস্কারে সকলে যেন জরাজীর্ণ। তাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে ভূতের ভয়, রাক্ষসের ভয়, পরীর ভয় এবং তার চেয়েও বেশী দুর্ভাগ্যের ভয়। সুবিখ্যাত ইংরেজ-লেখক আলডুস হাক্‌স্‌লী বলেন, কাশ্মীরীদের প্রতিভা প্রকাশ পায় অখণ্ড নোংরামিতে। বলা বাহুল্য, শীতপ্রধান দেশ বলেই শারীরিক নোংরামি তাদের মজ্জাগত।

কাশ্মীরীদের প্রধান খাদ্য হ'ল, ভাত। ওদেশে ধান হয় প্রচুর। শুধু ধান নয়, খাদ্য-প্রাণযুক্ত ফলমূল, শস্য, সব্জী, আঙ্গুর, বাদাম এত বেশী, অথচ আহারের যত্ন ওদের নেই। অশিক্ষায় আর কুসংস্কারে ওরা অন্ধ, তার ওপরে আছে চিরস্থায়ী দারিদ্র্য,—কিন্তু দেশের জল-বাতাসের গুণ আশ্চর্য; কাশ্মীরীরা সাধারণত বলবান এবং পরিশ্রমী। দুর্গম পাহাড়ে তারা পিঠের উপর দু'চার মণ মাল চাপিয়ে আনাগোনা করে। ওই রকম মাল নিয়ে তারা একাদিক্রমে হয়ত এক সপ্তাহ ধ'রে একশো মাইল পার্বত্যপথ অতিক্রম করে।

কাশ্মীরের মেয়েরা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী—এবং তারা পুরুষদের সঙ্গে সমানে মেহনত করে। তারা নৌকা চালায়, গাড়ী চালায়, কুলীগিরি করে, ধান বোনে, শস্য কাটে, ঢেঁকি কোটে, আবার কুটীরশিল্পের কাজ করে। মেয়েরা স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, নির্ভয়। তারা কাজের সঙ্গে গান গায়, নৌকায় বসে গল্প করে, নিজেদের ঘরকন্নার জন্য তারা

বাইরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। শরীর-চর্চা করা তাদের অভ্যাস।

কাশ্মীরে প্রবেশ করলে পৃথিবী নতুন বলে মনে হয়, কেননা জীবন সেখানে অতি বিচিত্র। কাশ্মীরে পৃথিবীর বহু পুরাতন সভ্যতার আস্বাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি এমন একপ্রকার অমরাবতীর সৌন্দর্যলোক আবিষ্কার করা যায়, যেটিকে বাস্তবিকই মর্ত্যলোকের স্বর্গ বলেই মনে হবে। কাশ্মীর হোলো সেই মহাসঙ্গম, যেখানে হিন্দু, মিশরীয়, গ্রীক, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সভ্যতা একাকার হ'য়ে অখণ্ড ঐক্যে মিলিত হয়েছে।

কাশী

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুললে যতগুলি নদী দেখা যায় গঙ্গা তার মধ্যে প্রধান। সমগ্র উত্তরভারত গঙ্গার জলে প্লাবিত। লোকে সেই কারণে গঙ্গাকে বলে প্রাণদায়িনী, পুণ্যময়ী। এই গঙ্গার তুই তীর ধ'রে যতদূর যাওয়া যায়, দেখা যাবে কত গ্রাম, কত নগর, কত সবুজ শস্যক্ষেত্র, কত মন্দির, মানুষের কত কীর্তিকলাপ! উত্তর প্রদেশে এই গঙ্গারই তীরে ভারতের তীর্থশ্রেষ্ঠ কশীধাম অবস্থিত। কত লোকে কাশীর কাহিনী কতবার শুনেছে, কিন্তু তবু বারাণসী তীর্থ চির-নূতন।

কাশীর চতুঃসীমানাকে বলে পঞ্চক্রোশী, অর্থাৎ, পাঁচ ক্রোশ পরিক্রমা শেষ করলে তবেই নাকি বারাণসী যাত্রা সার্থক হয়। কাশীর গঙ্গা উত্তরবাহিনী এবং পঞ্চমীর চাঁদের মতো খণ্ডচন্দ্রাকার। উত্তর সীমানায় রয়েছে বরুণা নামে ছোট নদী এবং দক্ষিণ সীমানায় অসি নদী! কাশী শহর অপেক্ষা কাশীর গঙ্গার ঘাটগুলি অধিক মনোহর। যে-কোন একটি ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে উত্তর ও দক্ষিণে সমস্ত ঘাট সহজে দেখা যায়। উত্তরে এপারে বহুদূরে দেখা যায় আদিকেশবের লাল চূড়া, তারপরে রাজঘাট, পৌরাণিক কালের সেই মণিকর্ণিকার ঘাট ও শ্মশান, মহীশূর প্রাসাদের সোপান, নেপাল মন্দিরের ঘাট, তারপরে মানমন্দির, দশাশ্বমেধ, অহল্যাবাঈ, দারভাঙ্গা, চৌষট্টি যোগিনী ইত্যাদি অসংখ্য ঘাট। দক্ষিণ দিকে কেদার, হরিশ্চন্দ্র, চেৎ সিং ইত্যাদি আরও বহু ঘাট দেখতে পাওয়া যাবে। সমস্তটা মিলিয়ে গঙ্গার শোভা কী অপরূপ এবং আনন্দদায়ক! দূর থেকে একদিকে দেখা যায় বেণী-

মাধবের প্রকাণ্ড দু'টি ধ্বজা, এবং অন্য পারে দেখা যায় রামনগরের বিশাল রাঙা দুর্গ।

আজকে অনেকেই জানে না কাশীর পথ একদিন ছিল দুর্গম। বাংলা দেশের লোক একদিন কাশীযাত্রার আগে আত্মীয়-পরিজনের কাছে চিরবিদায় নিয়ে আসত। তখনকার কালে রেলপথ ছিল না, লোকে আসত পায়ে হাঁটা পথে কিংবা নৌকাযোগে গঙ্গার পথ ধ'রে। গঙ্গা যে পথ দিয়ে বয়ে এসেছে সেই পথ দিয়ে তাদের নৌকা এককালে পাড়ি দিত কাশীর দিকে। যারা পৌঁছতো তারা ভাগ্যবান, আর যারা পৌঁছতে পারত না তারা হারাত গঙ্গায়, তাদের প্রাণ বিপন্ন হ'ত চোর-ডাকাতের হাতে, তাদের নৌকা তলিয়ে যেত ঝড় আর তুফানে। পায়ে হেঁটে যারা যাত্রা করত তাদের পথ ভুল হয়ে যেত বার বার। কত লোক মরেছে অনাহারে, কত যাত্রীকে মেরেছে জানোয়ারে, কিন্তু ইতিহাসের অতীত কাল থেকে যুগে যুগান্তরে পুণ্যকামী নরনারীকে এই বারাণসী তীর্থ অবিরাম আকর্ষণ ক'রে এনেছে। বিশ্বনাথের সোনার মন্দির আবহমানকাল থেকে মানুষকে পথ ভুলিয়ে এনেছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কাশীর গঙ্গার জল চিরকাল ধ'রে মানুষের মালিন্য ঘুচিয়েছে, মানুষকে শক্তি ও বীর্য দান করেছে, মানুষের জন্য খাদ্যসম্ভার সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় বড় নগরগুলিতে যেমন বহুজাতির লোকের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, কাশীতেও তেমনি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নরনারী ধর্মচর্চার জন্য বারাণসীতে এসে বাস করে। সুদূর মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর মহীশূর ইত্যাদি অঞ্চলের বহুলোক এখানে পুরুষানুক্রমে বাস করে। এ ছাড়া মাড়োয়ারী, সিন্ধি প্রভৃতি লোকেরা তো আছেই। ভারতবর্ষের মধ্যে যত দেশে সংস্কৃতচর্চা হয় বারাণসী তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এখানকার বাতাস শঙ্খধ্বনিতে, কাঁসরবাদ্যে,

মঙ্গলঘণ্টায় নিত্য মুখরিত। সাধু সন্ন্যাসী, বৈরাগী বাউল, দার্শনিক পণ্ডিত, সকলের এমন একত্র সমাবেশ সম্ভবত ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দেশের বহু পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, নদীর ধারে এমন শোভাময় নগর জগতের যে কোন স্থানে বিরল।

বারাণসী শিবের পীঠস্থান। এখানে সর্বত্রই শিবের মন্দির। পথ, ঘাট, মাঠ শিবলিঙ্গে পরিপূর্ণ। সেই কারণেই এখানে হিংসার লেশমাত্র নেই। দেবীর পূজার জন্য এখানে কোন বলি হয় না। শহরের বহিঃসীমানায় দেবী দুর্গার মন্দিরে বছরে একবার পশুবলি হয় মাত্র। সম্ভবত কাশীতে অহিংসার এই ভাবটি এসেছে বৌদ্ধ পীঠস্থান সারনাথের প্রভাব থেকে। বারাণসী থেকে সারনাথ মাত্র তিন ক্রোশ পথ। এখানে বৌদ্ধ যুগের সেই সুবিখ্যাত স্তূপ দেখা যায়। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধদেব এই মনোরম স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন এবং উত্তরকালে আনন্দ প্রমুখ তাঁর প্রিয় শিষ্যরা এখানে একটি বিশাল মঠ স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি কয়েক বছর হ'ল বহু অর্থব্যয়ে এই সারনাথ প্রাঙ্গণে মূলগন্ধকুটি বিহার স্থাপিত হয়েছে। এখানকার চিত্রশালা দর্শনীয় বস্তু। কাশীর রাজঘাট থেকে কিছুদূরে কয়েক বছর যাবৎ একটি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেটি হ'ল এনি বেশান্ত কলেজ। শহর থেকে দূরে নিরিবিলি মাঠের মাঝখানে এই বিদ্যামন্দির অনেকটা যেন বোলপুর শান্তিনিকেতনের আদর্শে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া সেনট্রাল হিন্দু কলেজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, এংলো-বেঙ্গলী কলেজ প্রভৃতি তো আছেই। শহর থেকে তিন মাইল দূরে নাগোয়া পল্লীতে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি জগতের পণ্ডিত সমাজের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী একদা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশীয় রাজন্যদের সাহায্যে এক কোটি টাকা চাঁদা তুলেছিলেন। সমগ্র

ভারতবর্ষে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় এমন বিরাট পরিধি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশনের মন্দির ছাড়া মনোরম হাসপাতালটি সেবাব্রতের চরম নিদর্শন। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে রোগীর চিত্তে প্রসন্নতা আনবার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত নেই। রোগীদের খাবার জন্য হাসপাতাল-প্রাঙ্গণেই শাক-সব্জীর বাগান তো আছেই, তা ছাড়া রোগীরা যাতে খাঁটি দুধ পায় তার জন্য যে গোশালা আছে তা' দেখবার মতো। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হাসপাতাল খুবই বিরল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমের যে কোন শহরের চেয়ে বারাণসীতে বাঙালীর সংখ্যা অধিক। এখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে বাঙালীদেরই চেষ্টায়। এই সুপ্রাচীন শহরের গায়ে আজকাল যে আধুনিক সভ্যতার ছাপ দেখা যায় তাতে বাঙালীর শিক্ষা ও রুচি যে মিশে রয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখানকার বাঙালী কলোনি আয়তনে ছোট নয়। পথে-ঘাটে বাঙালীদের সংখ্যা দেখলে এমনও অনেক সময় মনে হবে যেন বাংলা দেশেরই কোন শহরে আমরা এসেছি। এ্যাংলো-বেঙ্গলী কলেজ স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাদের ছেলে-মেয়েদেরই শিক্ষার জন্য স্থাপিত এবং এরও মূলে ছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী। কাশীকে তাই আমরা আমাদেরও শহর ব'লে গর্ব অনুভব করতে পারি।

বোম্বাই

ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলই আর আমাদের কাছে বিদেশ নয়। বহুকাল আগে যখন পায়ে-হাঁটা পথ ছিল, লোকেরা তখন বিদেশের নামে ভয় পেত। তখনকার দিনে যারা গয়া, কাশী, বৃন্দাবন যেত, তারা অনেক সময় প্রাণের আশা করত না। রেলপথ হবার আগে দিল্লী, বোম্বাই যে কতদূরে, সাধারণ লোকে তার বিশেষ খোঁজ-খবর রাখত না।

কিন্তু এখন লোকে সে-সব কথা ভুলতে বসেছে। প্রপিতামহ-প্রপিতামহীরা বেঁচে নেই, সুতরাং গল্প শোনাবার মানুষ কম; তাই দেখতে দেখতে সেকালের কাহিনীর প্রায় সমস্তটাই মাটি চাপা প'ড়ে গেছে। প্রাচীনকালের স্থাপত্য-কীর্তি আর অতীতকালের কাহিনী —এই দুটো জিনিস আজ মাটি খুঁড়ে বার করতে হয়। এখন ঘটে গেছে যুগান্তর। একমুহূর্তে আমরা টেলিফোনে কথা বলি দিল্লী আর বোম্বাইয়ের সঙ্গে, উড়ো জাহাজে ক'রে কয়েকঘণ্টায় চ'লে যাই ভারতের অন্য প্রান্তে—সুতরাং বিদেশের দূরত্ব আজ আর কোথায়? এদিকের মানুষ ওদিকের সঙ্গে মিলে গেছে, অর্থাৎ এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের জানাজানি চলছে পদে পদে। মানুষের বৈচিত্র্য আর নূতনের বিস্ময় অনেকটাই গেছে ক'মে।

কিন্তু তবু পথের দূরত্বটা আজও রয়ে গেছে। কত পথ গেছে কত দিকে, কত রহস্য রয়ে গেছে পথে পথে। ভারতের এপ্রান্তে আমরা আছি, এবং অন্য প্রান্তের কথা ভাবি। এ দুয়ের মাঝখানে কত

রকমের বৈচিত্র্য। কত গিরি, নদী, বন, কত উপত্যকা আর মালভূমি, কত নদীর ইসারা আর কত পথের সঙ্কেত! বোম্বাই পৌছতে হ'লে এদের পেরিয়ে যেতেই হবে—এরাই হ'ল পথের কাহিনী,—এরাই আজও আমাদের কল্পনাকে সজীব ক'রে রেখেছে।

বোম্বাই শহর কলকাতার মতো বৃহৎ ও ব্যাপক নয়। কিন্তু শহর সুপুষ্ট, ঐশ্বর্যশালী। আজকালকার মহানগর—যেমন কলকাতা—বহু জাতীয় লোকের বাস, বহুজনের বহু ভাষায় নিত্য মুখর। কলকাতা থেকে সমুদ্র যেমন একশো মাইল দূরে, বোম্বাই তা' নয়—বোম্বাই শহর সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। ঠিক উপকূলে বললে ভুল হবে, বোম্বাই শহর একরূপ সমুদ্রের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে,—অর্থাৎ বোম্বাই হ'ল একটি ছোট্ট দ্বীপমাত্র। এই দ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র হ'ল একটি সাঁকো। দ্বিতীয় বৈচিত্র্য হ'ল প্রায় সমগ্র বোম্বাই প্রদেশ পশ্চিমঘাটের পার্বত্য ভূভাগে জড়িয়ে রয়েছে। মাদ্রাজের পূর্বঘাট আর বোম্বাইয়ের পার্বত্য পশ্চিমঘাট যেন দক্ষিণ ভারতের দু'টি বৃহৎ দেওয়ালের মতো। বলা বাহুল্য, বোম্বাইয়ের প্রাকৃতিক শোভাও যেমন সুন্দর, আবহাওয়াও তেমনি স্বাস্থ্যকর। খুব বেশী গ্রীষ্ম কিংবা খুব বেশী শীত কোনোটাই নেই—বছরের সমস্ত সময়টাই যেন বসন্তকালের মতো।

ভারতের বাইরে থেকে জাহাজযোগে যেসব বিদেশী ভারতে এসে পৌঁছয় তাদের চোখে প্রথম দৃশ্যমান হয় এই বোম্বাই। অনন্ত নীল সমুদ্রের উপকূলে প্রথম শ্যামলের শোভা দেখে তারা মুগ্ধ হয়, মরুভূমির দিগন্তে মরীচিকা যেমন মানুষকে মুগ্ধ করে। বোম্বাই হ'ল ভারতের পশ্চিম তোরণদ্বার। চারিদিকের ঐশ্বর্য দেখে মানুষ অভিভূত হয়, সমগ্র বোম্বাই যেন তাদের অভ্যর্থনা জানায়। ইতিহাসের গতি এবং সঙ্গতির সঙ্গে দিল্লী নগর যেমন বারংবার নাড়া পেয়ে এক

এক জায়গায় স'রে বসেছে, বোম্বাই অথবা কলকাতা তেমন নয়। কলকাতার মতন বোম্বাই শহরও জাহাজঘাটাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে, সুতরাং এসব অঞ্চলকে আধুনিক বলা যেতে পারে। নানা লোক এসে বোম্বাইতে বাসা বেঁধেছে, প্রাচীন ইতিহাস বলতে কিছু নেই। চীনা, জাপানী থেকে ইংরেজ ও আমেরিকান—সকলেরই জায়গা হয়ে গেছে এখানে। এদের কেউ মিশনারী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ বা শিক্ষাবিদ্। দেশের অন্তরলোকে তারা ঢোকেনি, তারা কেবল জাহাজঘাটার ধারে সুবিধামতো আস্তানা পেতে ব'সে গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মারাঠা, ভাটিয়া, পার্শি ও মুসলমানরা বোম্বাইতে ঐশ্বর্য ও সম্পদ সৃষ্টি করেছে। বহু জাতির সমন্বয় এই নগরে বহুকাল ধ'রে ঘটলেও, হিন্দুরা একটি নিজস্ব সভ্যতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়ে গেছে। তারা বাণিজ্য বেসাতি করে, শিক্ষা ও সভ্যতা ছড়ায়, ধর্ম-জীবনকে অবিচলিত রাখে এবং দেশের ভিতরে প্রাণধারাকে সঞ্চালিত করে। তারা জায়গা নিয়েছে অনেকখানি, কিন্তু জায়গা দিয়েছে সবাইকে ; অপরকে সরিয়ে নিজেদের চারিদিকে গণ্ডি কেটে রাখেনি। মিলেছে সকলের সঙ্গে, দিয়েছে দুই হাতে।

কলকাতার মতন বোম্বাই শহর এত বৃহৎ নয়, এমন অসংখ্য প্রাসাদশ্রেণীও সেখানে দেখা যায় না, তবু বলব ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে বোম্বাই শহর বেশী অগ্রসর। আবার, কলকাতা যেমন ভারতের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে, বোম্বাই অথবা দিল্লী তেমন নয়। বোম্বাইয়ের মন প্রধানত ব্যবসায়ী মন, সেখানে সম্পদ্ সৃষ্টির আনুষঙ্গিক যা কিছু সমস্তই মেলে। কালক্রমে কলকারখানা গ'ড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট, যন্ত্রপাতির গবেষণার দিক থেকেও বোম্বাই অনেকখানি প্রাধান্য লাভ করেছে। কলকাতায় যেসব যন্ত্রের পরিচালনা এখনও আরম্ভ হয়নি, বোম্বাইতে

ইতিমধ্যেই তাদের ব্যাপক পরীক্ষা চলেছে। খাদ্য, কুটীর-শিল্প, ছাপাখানা, আসবাব সজ্জা, সিনেমা ফটোগ্রাফী—ইত্যাদি বহু বিষয়েও নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে কাজ চলছে। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্নস্থানে গবেষণাগার সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় সংগঠন ও পুনর্গঠনের কাজ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কি প্রকারে সম্পন্ন হ'তে পারে, তাই নিয়ে বড় বড় পরিকল্পনা বোম্বাইতে তৈরী হচ্ছে।

পঁচিশ বছর আগে বোম্বাইয়ের যে চেহারা ছিল আজ আর তা' নেই। সেখানে ভেঙেছে অনেক, কিন্তু গ'ড়ে উঠেছে তার চেয়ে ঢের বেশী। বাবুলনাথের সেই মন্দির আজও আছে, সাগরের উপকূলে মহালক্ষ্মীর সেই মস্ত মন্দির এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু পুরোনো বোম্বাইতে ভাঙন দেখা দিয়েছে নূতন পত্তন আনার জন্য। সমগ্র ভারতের মধ্যে বোম্বাই অনেক বিষয়ে প্রগতিশীল,—বোম্বাইবাসীরা রুগ্নচিন্তা ও পুরোনো সংস্কারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনা,—তারা এগিয়ে চলতে জানে। সেখানকার পথে ঘাটে, বাজারে, সমুদ্রের ধারে যেখানেই বেড়াও, দেখবে সমস্ত উন্নতিশীল, সমস্ত সক্রিয় এবং বেগবান। পুরোনো যুগের বিশ্বাস এবং ব্যবস্থাকে বোম্বাইবাসীরা এক হাতে ভাঙছে.—অন্য হাতে গ'ড়ে তুলছে নূতন জীবন, আর জীবনের নূতন শিল্প।

আরব সমুদ্র-তীর

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভূগোল অনেককাল থেকে এক হয়ে মিলে রয়েছে। ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অবস্থিতি এমন এক রকমের যে, এর সমস্তটাই প্রাকৃতিক দুরূহতা দিয়ে ঘেরা। উত্তরদিকে হিমালয়ের অবরোধ এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতি চিরদিন আমাদের পাহারার কাজ করেছে। কিন্তু একথা কোনদিন মনে হয়নি যে, এই পাহারা যদি ভাঙে, অথবা একে যদি অতিক্রম করা যায়, তবে আমরা দাঁড়াবো কোথায়। ভারতবর্ষ একদিন বাইরের সমুদ্রপথে বাণিজ্য করেছে,—প্রমাণ পাওয়া যায় রোমকসভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতীচ্যের যোগাযোগ ছিল। দু'হাজার বছর আগে—এবং হয়ত তারও অনেক আগে—বিদেশীরা এসেছিল সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতে; এখনও তাদের উত্তর পুরুষরা সেখানে বর্তমান রয়েছে। এককালে হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার ছিল প্রায় অষ্ট্রেলিয়ার সীমানা অবধি, তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সম্রাট অশোকের প্রেম ও অহিংস আদর্শবাদ সমগ্র পূব এশিয়াকে ঐক্যসূত্রে গেঁথেছিল। তার চিহ্ন আজও পাই চীনদেশে, দক্ষিণ রুশিয়ায়, ইরাণে ও আফগানিস্থানে। তার চিহ্ন রয়ে গেছে শিঙ্গাপুরে, যাভায়, বলিতে, সুমাত্রায়, কম্বোজে, শ্যাম ও ইন্দোচীনে। এসব অনেক আগেকার কথা। কেউ অবিশ্বাস করে, কেউ বিস্ময় বোধ করে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং আমাদের কিছু ইতিহাস শুনিয়েছেন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে, অর্থাৎ ছয়শো

বছর আগে, মরক্কোবাসী ভ্রমণবীর ইবন বতুতা এদেশের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিয়ে রেখেছেন। যাই হোক, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে আমরা কিন্তু উত্তর ভারতের ইতিহাসই আলোচনা করেছি, দাক্ষিণাত্য ছিল অনেকটা ইতিহাসের অস্পষ্টলোকে।

মনে হচ্ছে আমরা সজাগ হয়েছিলুম পঞ্চদশ শতাব্দীতে—যখন জানতে পেরেছিলুম, পর্তুগীজ জলদস্যুরা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে নানা মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা নদীতে এসে ঢোকে, কোনো কোনো বন্দরে নোঙর ফেলে, কোথাও কোথাও বিবাদ বাধায়, কিছু বা লুটতরাজ করে, আবার একসময় গা ঢাকা দেয়। মুস্কিল হ'ল এই, ভারতের উপকূল এত বিস্তৃত এবং অরক্ষিত যে, বাইরের শত্রুকে বাধা দেওয়া সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এরই ফলে আমরা দেখেছি সাড়ে চারশো বছর আগে এসে পর্তুগীজরা গায়ের জোরে জায়গা জমি দখল ক'রে আরব সমুদ্রতীরে ব'সে গেছে এবং সে জায়গা আজও তারা ছাড়েনি। তারপর এই আরব সমুদ্র পেরিয়েই একদিন এসেছিল ফরাসীর জাহাজ কিন্তু পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের পরাজয়ের ফলে ভারতে ইংরেজের প্রাধান্য হওয়ায় এদেশে ফরাসীরাজ্য বিস্তারলাভ করেনি। আমাদের মুস্কিল হ'ল এই যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে উন্নতিলাভ ক'রে পাশ্চাত্য জগৎ যখন জলপথে জয়যাত্রায় বেরিয়েছে, আমরা তখন দেশের চৌহদ্দির মধ্যে গৃহবিবাদ নিয়ে ব্যস্ত। তা' ছাড়া আমাদের বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নতি সাম্রাজ্যবাদী দলের পছন্দসই ছিল না।

পূর্ব সাগরের পথ ধ'রে ভারত একদা যেমন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি পশ্চিমসমুদ্র অর্থাৎ আরব সাগর অতিক্রম ক'রে ভারতবাসী অভিযান করেছিল নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে। প্রথমটায় ছিল সাংস্কৃতিক অভিযান,

দ্বিতীয়টিতে ছিল বহির্বাণিজ্য প্রচেষ্টা। এইপ্রকার আদান-প্রদান সেই অবধি প্রচলিত ছিল—যে সময়টায় গ্রীকরা ভারত অভিমুখে অভিযান করে। পশ্চিম ভারতের তথ্য আলোচনা করলে এই সকল অভিমতের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। হিন্দুভারতের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টা এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রপথে নানাদিকে বিচ্ছুরিত হয়েছে একথা আমরা জানি।

মোগল পাঠান যুগের পর ইংরেজ আসে পশ্চিম সমুদ্র পথে। আরব সাগরের তীরে তারা ঘাঁটি খুঁজে পায়, তারপর মোগল দরবারে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানিয়ে তারা বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। সেই থেকে আরব সাগরের নতুন ইতিহাসের আরম্ভ।

পূর্ব আফ্রিকা ও এডেন থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণ ভারতের ত্রিবান্দ্রম্ অবধি আরব সমুদ্রের বিস্তার ধরা যায়। আজও এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফরাসী, পর্তুগীজ ও ইংরেজের বন্দর পশ্চিম ভারতের আরব সমুদ্রতীর শাসন করছে। ছোট ছোট দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং সুবিধাজনক সুরক্ষিত বন্দরের ঘাঁটি আরব সমুদ্রে যত বেশী বঙ্গোপসাগরে তত নেই। সুয়েজ প্রণালী ও বাবেল্-মাণ্ডেব পেরিয়ে এডেন বন্দর পাওয়া গেল—সেখান থেকে করাচী, বীরবল, বোম্বাই, মাহে, কোচিন, গোয়া, ডামান্, ডিউ অথবা ত্রিবান্দ্রম্—এই সমস্তগুলিই বড় বড় জাহাজ ঘাঁটি। এডেন ও করাচী ছাড়া এরা সকলেই পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর। করাচী এই সেদিনেও ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, ভারত-বিভাগের পর এখন পাকিস্তানের রাজধানী হয়েছে। আরব সাগরের উত্তর তীরবর্তী দক্ষিণ বেলুচিস্তানের অধিকাংশ মরুভূমি, সুতরাং করাচীই হ'ল বর্তমানে পাকিস্তানের প্রধান বন্দর। পশ্চিম ভারতের যারা হিন্দু বণিক—রাজপুত, ভাটিয়া, সিন্ধি, কাচ্ছি অথবা পঞ্জাবী—পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পর্যন্ত করাচীতে তারাই

ছিল প্রধান। ফলে হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতি, দেবমন্দির ও নাটমন্দির, ঐশ্বর্য ও সম্পত্তি—সব মিলিয়ে হিন্দুদের প্রতিপত্তি ও প্রভাবই করাচীতে ছিল বেশী।

বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, পূর্বপ্রান্তের চট্টগ্রাম অঞ্চলের চন্দ্রনাথ তীর্থ থেকে আরম্ভ ক'রে পশ্চিম প্রান্তের করাচী অবধি হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথের প্রায় সর্বত্রই অগণ্য দেবতার দেউল, মন্দির ও দেবপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ বাংলায় কপিলমুনির আশ্রম, উড়িষ্যায় কোনারকের সূর্যমন্দির, মাদ্রাজের শ্রীরঙ্গম, কাঞ্জিভরাম, মীনাক্ষী, দক্ষিণে রামেশ্বরম্, কোচিন ও ত্রিবান্দ্রমের বিরাট মন্দিরগুলি, কন্যাকুমারিকার মন্দির, বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী, তারপর কাথিয়াওয়াড়ের দ্বারকা, ওখা বন্দরের ভেট্দ্বারকা, কাছ ও কাম্বে উপসাগরের উপকূলে এবং করাচীর আশেপাশে শত শত দেবপ্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ হিন্দুসভ্যতার অন্তর্নিহিত যে শান্তশ্রী, এবং অধ্যাত্ম সংস্কৃতির ভিতরে যে সর্বকালজয়ী লোকোত্তর আদর্শ—হাজার হাজার বছর ধরে তা' নিজেকে প্রকাশ করেছে এমনি ভাবেই। আরব-সাগরের উত্তর উপকূলে যেমন প্রভাতের দেবতা-বন্দনা ও সন্ধ্যারতির শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়, তেমনি সমগ্র পূর্ব উপকূলে অর্থাৎ পশ্চিমভারত প্রান্তে শত শত যোজন ব্যাপী স্থলপথে হিন্দুসভ্যতার বিরাট বিরাট কীর্তিস্তম্ভগুলি আরবসমুদ্র-পথের যাত্রীদের চিরকাল ধরে দিক নির্দেশ ক'রে আসছে।

সম্ভবত ভৌগোলিক কারণেই আরব সমুদ্রের তীর বঙ্গোপসাগর অপেক্ষা শান্ত—ঝড় ও ঝঞ্ঝা অপেক্ষাকৃত কম। সমুদ্রের আলোড়নে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও আরবসাগরের উপকূলের যেন ধ্যানভঙ্গ হ'তে চায় না। পশ্চিমঘাট অর্থাৎ মালাবার উপকূলের সাগরশোভা অতি অপরূপ। অনেকে বলেন, এটি চিরবসন্তের দেশ।

পাহাড়ের চূড়া থেকে আরবসাগরের নীল শোভা অবর্ণনীয়। উত্তর ও দক্ষিণে সাগরের তীর ধ'রে শত শত মাইল ভ্রমণ করলেও কোথাও বিরোধের চেহারা চোখে পড়ে না। শাক্ত, বৈষ্ণব, অদ্বৈতবাদী অথবা বৌদ্ধধর্মী—এরা সবাই জায়গা পেয়েছে, সমুদ্র উপকূলে মন্দির নির্মাণ করেছে। এদের ধর্মমতে যত পার্থক্যই থাকুক, আরবসাগরের বিশাল পটভূমিতে এসে এরা এক হয়ে মিলেছে, একতার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। ভারতের চারটি মহাতীর্থ অর্থাৎ চারটি ধামের মধ্যে তিনটি সমুদ্র উপকূলে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বসাগরের উপকূলে পুরীধাম, ভারত মহাসাগরের উপকূলে অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণের সর্বশেষ স্থলবিন্দুতে হ'ল রামেশ্বরম্ ধাম, আর আরবসাগরের উপকূলে দ্বারকাধাম। চতুর্থ ধামটি হ'ল হিমালয়ের বদরিনাথ।

বাইরে থেকে যারা আরব-সমুদ্রপথে ভারতের অভিমুখে প্রথম আসে, তারা কী দেখে? তারা দেখে করাচী থেকে ত্রিবাঙ্কুর অবধি সমগ্র আরবসমুদ্রকূল মন্দির ও দেবদেউলের প্রদীপের মালায় উদ্ভাসিত। পৃথিবীর সকল সমুদ্রের উপকূল অশান্তি ও বিরোধে পরিপূর্ণ। কিন্তু পশ্চিম ভারতের সমুদ্রতীর মানবতার আদর্শ প্রচার ক'রে চলেছে শান্তির সামগানে। পাশ্চাত্যের পথভ্রান্ত সভ্যতা আরবসাগরের পূর্ব উপকূলে এসে আনন্দের আশ্রয় খুঁজে পায়, মন্দিরের সন্ধ্যারতির আলোয় তারা আবিষ্কার করে জীবনের বিরাটতর পরিচয়, মহত্তর আদর্শবোধ,—কেন না আরবসাগরের উপকূলে ব'সে হিন্দুসভ্যতা সেই কোন্ অজানা কাল হ'তে জগতের অন্যান্য সকল ধর্মের ও সকল জাতির সভ্যতাকে আদি জননীর মতো আপন স্নেহচ্ছায়ায় সন্তানের মতো লালন করে আসছে।

মরণজয়ী বীর

দুঃসাহসিক বীর যাঁরা, তাঁদের সম্বন্ধে গল্প শোনবার কৌতূহল কোনো যুগেই কম নয়। ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েও তাঁরা ইতিহাসের অতীত বস্তু। তাঁদের কাহিনী, তাঁদের অতিমানবিক অধ্যবসায় এবং বীরত্ব, দুর্গমকে করতলগত করার জন্য তাঁদের জীবনজোড়া তপস্যা, এ সমস্তই যুগে যুগে এবং কালে কালে মানব জাতিকে অনুপ্রাণিত করে।

দুঃখজয়ী যারা, দুঃসাধ্যকে জয় করার জন্য তাঁরা ছুটে গেছেন সেইদিকে, সাধারণ মানুষ যে পথে হাঁটে না। তাঁরা প্রচলিত ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করেছেন, নূতন মানচিত্র সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের অভিযাত্রায়, চিন্তাধারায় এনে দিয়েছেন তাঁরা নূতন বিষয়বস্তু, এবং সকলের চেয়ে বড় কথা, তাঁদের আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা প্রসারলাভ করেছে। গহন অরণ্যে, দুরারোহ পর্বতমালায়, চিরতুষারময় মেঘলোকে, পশুকঙ্কাল-পরিকীর্ণ নির্জলা নিষ্ফলা মরুভূমিতে,—এবং আরো কত অগম্য স্থানে নির্ভীক বীরের দল হাসিমুখে চ'লে গেছেন। তাঁদের সেই যাত্রাপথের ইতিবৃত্ত যে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে কত মণিমানিক্য যুগিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই!

শক্তিমান বীরের জন্ম হয়েছে সকল দেশে, সকল যুগে। কেউ তাদের খোঁজ পেয়েছে, কেউ বা কোনো ইতিহাসেই তাদের খুঁজে পায়নি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধ, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য, জ্ঞানভিক্ষু দীপঙ্কর—এঁরা বীরত্বের কঠিন

সাধনা করেছিলেন। পাশ্চাত্য অভিযাত্রিকের মতো এঁরা কেবল কায়িক পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হননি,—আদর্শের জন্য, মানব-কল্যাণের জন্য এঁরা বরণ ক'রে নিয়েছেন সহস্র দুঃখ-বিপদ, গিয়েছেন দুস্তর ও দুর্গম পথে। হিংস্র জন্তু, ভীষণ অরণ্যানী, ভয়াবহ পর্বতমালা, বিশাল মরুভূমি—কোনো কিছুকেই এঁরা তাঁদের পথের অন্তরায় ব'লে মনে করেন নি। আমাদের দেশে প্রায় সকল যুগেই এই প্রকার বীর জন্মগ্রহণ করেছেন। ইতিহাসে কেউ দাগ রেখেছেন, কেউ বা নিজের হাতে দাগ মুছে দিয়ে চ'লে গেছেন।

পাশ্চাত্য দেশে বীরের দল জন্মগ্রহণ করেছেন বীরত্বকে প্রকাশ করার জন্য, অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশের অদম্য ক্ষুধাকে তৃপ্ত করার জন্য, আর অভিজ্ঞতা আহরণ করার জন্য,—জীবনের মহত্তর আদর্শ প্রকাশ করার জন্য নয়। কিন্তু সেই কারণে তাঁরা ছোট নন্, তাঁরাও নমস্য। ক্যাপ্টেন কুক্, লিভিংষ্টোন্, স্কট্—এঁরা সকল যুগেই সম্মান লাভ করবেন, সন্দেহ নেই। তেমনি বাঙ্গালী-বীর শরৎ দাস, রাধানাথ শিকদার, সুরেশ বিশ্বাস, মাবেন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র—এঁরাও দুঃসাহসিক পথযাত্রার ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন, একথা নিঃসংশয়ের বলা চলবে। এঁরা এক এক যুগে নূতন নূতন ইতিহাস রচনা করেছেন, এঁদের বীর্যবত্তাকে মানুষের সমাজ সানন্দে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

ইউরোপে গত যুগে যাঁরা বীরের কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হেডিন্ হ'লেন প্রধান। পৃথিবীব্যাপী তাঁর সম্মান ও সমাদর। তিনি ইংরেজ নন্, তিনি সুইডিস্। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে স্টক্‌হলমে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন নগরের প্রধান স্থাপত্য-শিল্পী। ছোটবেলা থেকেই হেডিন্

যেমন মানচিত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তেমনি তাঁর ভালো লাগত উত্তর মেরুলোকের যে কোনো ভ্রমন-কাহিনী। বালকের মনের এই দুঃসহ ক্ষুধাই পরবর্তীকালে তাঁকে আর ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি। তাঁর বয়স যখন একুশ বছর, সেই সময় সুদূর সুইডেন থেকে বিচিত্র পথ ধ'রে তিনি এসে পড়েছিলেন মেসোপোতেমিয়ায়,—এবং সেখান থেকে পারস্যে। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সুইডেনের রাজনীতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পারস্য-সম্রাটের কাছে উপস্থিত হন্ এবং সেই সূত্রেই মধ্য-এসিয়ার পথঘাটের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁর আবাল্যের স্বপ্ন খোরাসান, তুর্কীস্তান এবং হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের পথরেখা তিনি তাঁর জাগ্রত চোখে দেখতে পান। এই সময় তিনি এক দুরারোহ পর্বতস্থলী অতিক্রম ক'রে সঙ্গীদের সকলকে বিস্মিত করেন।

অতঃপর হেডিন্ অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও দুঃসাহসিক ভ্রমনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর বয়স যখন তিরিশ, তখন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ এসিয়া-ভ্রমন আরম্ভ হয়। তিনি আরল্ সমুদ্র পেরিয়ে তুর্কীস্তানের ভিতর দিয়ে খাসগড়ের দিকে অগ্রসর হন্। এর আগে এতবড় বিশাল মরুভূমি কেউ অতিক্রম করেন নি। তারপর হেডিন্ সাহেব মোস্তাগ-গিরিপথের মানচিত্র প্রস্তুত করার জন্য অগ্রসর হন্, এবং সেই দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন ক'রে তিনি ছদ্মবেশে তিব্বত অতিক্রম করেন। সেখান থেকে বহু বাধা ও বিপদের ভয় তুচ্ছ ক'রে পদে পদে বিপন্ন জীবনকে রক্ষা ক'রে তিনি চ'লে গেলেন চীনদেশের পূর্বপ্রান্তবর্তী নগর পিকিংএ। তাঁর বীরত্বের জন্য তিনি যে কেবল খ্যাতিলাভ করেন তাই নয়, তাঁর আনুপূর্বিক সংবাদ-সংগ্রহ-বুদ্ধির অপূর্ব কলাকৌশল এবং নির্ভুল ও নিখুঁত মানচিত্র-রচনা তাঁকে

জগতের বিদ্বজ্জনসভায় স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। দেশ-বিদেশের বড় বড় ভ্রমনবীর তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানায়।

বিস্ময়ের কথা এই, যেখানে যত বিপদ ও দুর্ভাবনা, যেখানে নিশ্চিত প্রাণভয় ও নিত্য উদ্বেগ—সেই দেশ এবং সেই পথ হেডিনকে বার বার আকর্ষণ করত। সেই জন্য তিব্বতের দিকে তিনি পুনরায় অভিযান করেন। মরুভূমিকে উত্তমরূপে জানবার এবং মরুভূমির বিশাল রুক্ষ পথের ভিতর থেকে অমূল্য তথ্য আহরণ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তিনি অবর্ণনীয় এবং অসহনীয় উৎপীড়ন ও দুঃখবেদনা সহ্য ক'রে তারিম্ ও গোবি মরুভূমির ভিতরে বিচরণ করেন। তিব্বতকে তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেন নি, তিব্বত তাঁকে বার বার দুর্গমের দিকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে। একদা তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করেন। তুষারের ঝড়, শত্রুর আক্রমণ, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখব্যাদান, হিংস্র শ্বাপদের করাল চক্ষু, ভয়াবহ সরীসৃপের চক্রান্ত—হেডিন্ সাহেবের অভিযানকে কোথাও প্রতিহত করতে পারেনি। কিন্তু তিব্বতের রাজধানী লাসার দিকে যাবার সময় তিনি যে বাধা পান, সেই বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। লাসার দরজা থেকেই এক প্রকার তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন। ডাকাতের দল তাঁকে ঘেরাও করে, তিব্বতী লামার দল তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁর জীবন ক্ষণে ক্ষণে চারিদিক থেকে বিপন্ন হয়ে ওঠে,—কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তিনি না করেছেন অস্ত্রপ্রয়োগ, না করেছেন রক্তপাত। তাঁর স্বভাবের মাধুর্য ছিল মনোহর। তিনি বহু ভাষা অনায়াসে বলতে পারতেন, মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা বিরূপশক্তিকে বশ করতে জানতেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ, বিভিন্ন জাতির মানুষ ছিল তাঁর বড় প্রিয়। তাঁর সাহিত্য-

প্রীতি ছিল প্রগাঢ়, ছবি আঁকতেন তিনি চমৎকার। আমাদের প্রিয় কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে হেডিন সাহেব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখতেন।

তিব্বতে গিয়ে লাসার দরজা থেকে কিন্তু সকলেই ফিরে আসেন নি। এই দেশেই জন্মেছিলেন একজন ইংরেজ—তিনি ভারতের ও বৃটিশের সামরিক শক্তির সহায়তায় তিব্বতের ধর্মগুরু প্রধান লামাকে বশ করেছিলেন। তার নাম হল স্যর ফ্রান্‌সিস্ ইয়ংহাসব্যাণ্ড। ভারতের বহির্ভাগে বহু দেশ ও রাজ্য তিনি জয় করেন এবং ভ্রমন করেন। জনশূন্য পামীর উপত্যকায় তার অভিযান সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ভৌগোলিক দিক থেকে তাঁব তিব্বত-অভিযান তাঁকে সমগ্র জগতে খ্যাতিমান ক'রে তোলে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তিব্বতের ভিতরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, এবং রাজধানী লাসা নগরের ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হন। স্যর ফ্রান্‌সিসের এই অভিযানের ফলে তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা ইংরাজ-শক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে গৌরীশৃঙ্গ-আরোহণের প্রচেষ্টায় দালাই লামা আরোহণকারীদের বিশেষ সহায়তা করেন। তাঁর এই সহায়তাই উত্তরকালে স্যর এডমণ্ড হিলারী আর শেরপা তেনজিং নোরগের গৌরীশৃঙ্গ অভিযান এবং গৌরীশৃঙ্গ জয় করার পথ বিশেষভাবে সুগম করে তোলে।

অনাবিষ্কৃত আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশে গিয়ে কত দুর্বহ জীবন যাপন করেছে কত বীর। কেউ মরেছে, কেউ বেঁচে গিয়েছে কোনো মতে। মধ্য আফ্রিকার অসংখ্য হ্রদের চারিদিকে কত বিভীষিকাময় অরণ্য, কত নরহন্তার শয়তানী চক্রান্ত, প্রকৃতির ভয়াবহ বিরূপতা, হিংস্র জানোয়ারের নিত্য আক্রমণ—কিন্তু বীরের দল তাদের প্রতি

ভ্রূক্ষেপ করেন নি। জোসেফ টম্‌সন্, বয়েড্ আলেকজান্দার—এরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক। এরা আফ্রিকার অরণ্যে ঢুকেছেন, দুর্গম জনহীন পার্বত্যপথে গিয়েছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছেন, দস্যুর বিষাক্ত বর্শাফলকের আঘাত সহ্য ক'রেও বেঁচেছেন। জোসেফ টম্‌সন্ আফ্রিকায় গিয়েছেন বার বার—আফ্রিকা তাঁকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যেত। ভ্রমন করেছেন—একা নিঃসঙ্গ, ঘুরে বেড়িয়েছেন আবিষ্কারের দুঃসহ ক্ষুধা নিয়ে,—অবশেষে দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগের পর পথের ধারে মুখ থুবড়ে অকালে মরেছেন। কোনো বীরের জীবন সার্থক হয়, কারো ঘটে শোচনীয় পরিণাম।

বয়েড্ আলেকজান্দার বনেজঙ্গলে শিকার করতে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন বিচিত্রবর্ণের পাখী সংগ্রহ করতে। তিনি গিয়েছিলেন পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকায়; পাখী-সংগ্রহের পথে আবিষ্কার করেছিলেন কতকগুলি দ্বীপ, এবং আরোহণ করেছিলেন ক্যামেরুন পর্বতমালার উচ্চতম শিখরে। অবশেষে এক নূতন পথে আলেকজান্দার এক জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। জনতা তাঁকে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করে।

কিন্তু প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতায় পাশ্চাত্য বীর্যবত্তা কোথাও প্রতিহত হয়নি—এইটিই শিক্ষার বিষয়। অজানাকে জানবার, অনাবিষ্কৃত জীবনকে খুঁজে পাবার, অগম্যকে করতলগত করবার পিপাসা মানুষের সহজাত। শাহারাকে শৃঙ্খলিত করবে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুলোকে রাজ্যপাট বসাবে, দুরারোহ ও দুর্গমকে জয় করবে, ভয়ভীষণা রুদ্রাণী প্রকৃতিকে বশীভূত করবে, রাক্ষস জাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে, সুদূর আকাশপথে প্রভুত্বের দাবী জানাবে,—এর জন্য মানুষ নিত্য ক্রিয়াশীল।

এরই জন্য কর্ণেল ফসেট্ গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকায়,—কত রহস্যলোকই এখানে সে ভেদ করেছিল। এ ছাড়া নরওয়ের বিখ্যাত বীর নানসেন্ ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। চির-তুষারাচ্ছন্ন গ্রীণল্যাণ্ড অতিক্রম ক'রে পৃথিবীবাসীকে বিস্ময়ে সে অভিভূত করে। নানসেন্ ছিল অধ্যাপক, ছিল উকীল—কিন্তু উত্তর মেরুলোক তাকে অস্থির ক'রে তুলত। সাইবেরিয়ার পথে পথে, বরফের ঝড়ে, গলিত তুষারের নিশ্চিত মৃত্যুভয়ের মাঝখানে নানসেন্ ছুটে যেত প্রাণ বিপন্ন ক'রে। অনেকে বলে, আধুনিক বীরদলের ইতিহাসে চরিত্রের দৃঢ়তায়, পৌরুষে, যোগ্যতা ও শক্তিমত্তায়—নানসেনের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন। নানসেন্ তার জীবনের শেষ অঙ্কে মানুষের কল্যাণের উপায় খুঁজে বেড়াত, উপবাসীর মুখে অন্নদান করত।

যারা বীর, তাদের মৃত্যু নেই—একথাটি যুগে যুগে সত্য।

দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গমে

সভ্য মানুষের চেয়ে অসভ্য মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশী, না কম? একথার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। পৃথিবীতে যতটুকু অংশের খবর আমরা রাখি, প্রায় ততখানি অংশ আজও আমাদের অজানা, একথা অত্যুক্তি নয়। মানচিত্রে তাদের নাম আমরা জানি, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় জানিনে। যে সকল ভূভাগে সভ্য জাতিদের বাস, সে সকল ভূভাগ বাদ দিয়ে দেখলেও পৃথিবী এখন অনেক বড়।

রাশিয়া ও চানদেশ নিয়ে আজ এত হৈ-চৈ, কিন্তু মহাচীনের পশ্চিমভাগ অথবা রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বভাগ কি আমাদের খুব পরিচিত? অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, গ্রীনল্যাণ্ড, পশ্চিম কানাডা, আলাস্কা—এদের অন্দর-মহলের কথা ক'জন জানে? প্রশান্ত মহাসাগরের শত শত দ্বীপ, আফ্রিকার মধ্য-পশ্চিম ভাগ, এমন কি আমাদের ভারতের অরণ্যলোক ও হিমালয়ের পাদভূমি—এদের সম্পূর্ণ খোঁজ-খবর আমরা ক'জন রাখি?

ঠিক এই রকম কথাই দক্ষিণ আমেরিকার সম্পর্কেও বলা চলে। দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ এলাকা কম। বোধ হয় সেই কারণেই, দুর্ভাগাবশত, আমরা তেমন-কিছু জানতে পারিনে। ভূগোলে আমরা কেবল ওই মহাদেশের কতকগুলি অংশের নাম শুনে এসেছি—যেমন কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডর, বোলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আরজেনটিনা, ব্রেজিল—ইত্যাদি। কিন্তু আর-একটু খোঁজ নিলে আমরা জানতে পারতুম, দক্ষিণ আমেরিকাতে যেমন দেখতে পাওয়া

যায় পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন দুর্গম ও ভয়ঙ্কর ভূভাগ খুব কমই আছে।

চারিদিকে সমুদ্র, পশ্চিমে সাত হাজার মাইল দীর্ঘ পর্বতমালা, হাজার হাজার মাইল অরণ্য, এবং এরই মাঝখানে বহু অংশে সভ্যতা-লেশহীন হিংস্র নরখাদক জাতির রাজত্ব। এই সকল ভূ-ভাগ কেবল অগম্যই নয়, আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছে। এই মহাদেশের উত্তর দিকে একটি ভূভাগ আছে—লম্বায়-চওড়ায় সহস্র সহস্র মাইল—তার নাম আমেজনিয়ন্ প্লেন। এই সমতল অরণ্যলোক উত্তরে ও দক্ষিণে এক হাজার মাইল এবং পূর্ব ও পশ্চিমে প্রায় তিন হাজার মাইল বিস্তৃত; অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষ আর-একটু ছোট হ'লেই এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারত।

আমেজন্ নদী—সে নদী অদ্ভুত। পৃথিবীর বৃহত্তম ও দীর্ঘতম নদীগুলির অন্যতম হ'ল আমেজন্। মাকড়সা যেমন নিজের চারিদিকে জাল বিস্তার করে, তেমনি আমেজন্ তার শত শত মাইলব্যাপী শাখা-প্রশাখার জালে এই সুবৃহৎ সমতল ভূ-ভাগকে চারিদিক দিয়ে যেন আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে। তীরে তীরে ভীষণ অরণ্য, নররক্তলোভী আদিম জাতি, হিংস্র সরীসৃপ ও শ্বাপদ, মারাত্মক কীট-পতঙ্গ, শোণিত-পিপাসু বাদুড়—এবং আরও শত রকমের জীব-জানোয়ারে আমেজনের বিস্তীর্ণ রাজ্য চিরকাল ধ'রেই বিপদ-সঙ্কুল। এই মাত্র ষাট-সত্তর বছর আগেও যে সকল দুঃসাহসী ও দুর্দান্ত অভিযানকারী এই বিশাল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করত, তারা আর প্রাণ নিয়ে কোনমতেই ফিরে আসতে পারত না। চারিদিকে কেবল নীরেট, জমাট ও জটিল জঙ্গল, নদীর খরতর প্রবাহ এবং তীরে তীরে ভয়ের বাসা—এ ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখা যেত না।

কিন্তু বিপদ ও মৃত্যুর পথে ছুটে যাবার জন্য তরুণের প্রাণ চিরদিনই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারা জীবনকে তুচ্ছ মনে করে, বীরত্বের লোভে প্রাণের মায়া করে না, দুর্গম দেশ আবিষ্কার করার আনন্দে তাদের বুকের রক্ত নিত্য অধির উন্মাদনায় থর্‌থর্‌ করে।

এই রকম একজন তরুণ বালকের কাহিনী আজ তোমাদের শোনাব।

ছেলেটির নাম ডন্‌। তার বাড়ী ছিল পেরুর অন্তর্গত এক শহরে। সেই শহরের এক ভূগোল-সমিতির সে ছিল একজন সভ্য। তার নীল দুটি চোখ ছিল অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর স্বপ্নে ভরা, তার মন ছুটে চলত নদী প্রান্তর অরণ্য পর্বত সমুদ্র অতিক্রম ক'রে যেন অজানা কোন্‌ জগতের দিকে! ডনের ছিল সুন্দর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, অটুট সঙ্কল্প এবং অলস জীবন-যাত্রার প্রতি অসীম বৈরাগ্য। তার প্রাণ কেবলই ছুটে যেত, যেদিকে দুঃখ ও দুর্ভোগ, দুর্গম ও দুর্যোগ, অন্ধকার ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা—সেইখানেই সে তৃপ্তি খুঁজে পেত।

এই ডন্‌ একদা তার ভাই গ্রেগরী ও আর ছয়জন বিশ্বাসী তরুণকে সঙ্গে নিয়ে আমেজনের পথে বেরিয়ে পড়ে। এই গৃহত্যাগী লক্ষ্মীছাড়ার দল যদি জানত কোন্‌ বিভীষিকার পথে সেদিন তারা মরিয়ার মতো ঝাঁপ দিল, তাহলে হয়ত যাবার আগে আর-একবার তারা থমকে দাঁড়াত। কিন্তু তাদের চক্ষে ছিল দুর্গমের স্বপ্নাবেশ, তাদের প্রাণের পিপাসা ছিল অদম্য—কোনো বিপদের কথাই তারা ভাবল না। পথে খাবার-সংস্থান কোথাও নেই, তার উপর উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, আবার সকলেই অনভিজ্ঞ—অথচ যেতে তাদের হবেই। অরণ্যের বিভীষিকা, দিশাহারা আমেজনের রহস্যময় পথ, অনাহার ও মৃত্যুভয়, নর-খাদকের আক্রমণ, প্রকৃতির উৎপীড়ন—এসব কিছুই তারা গ্রাহ্য করল না।

কল্পনার আকাশে সোনার স্বপ্নের জাল বুনে বুনে সেই দুঃসাহসী তরুণের দল উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে পাহাড়-পর্বত এবং অতিক্রম ক'রে চলেছে পর্বত-অরণ্য। কোথাও বা বেতবন ও কাঁটাঝোপের উপর নেমেছে অন্ধ কুয়াশা, তারপর পাহাড়ের ভীষণ চড়াই ও উৎরাই—তাদেরই মাঝখানে হয়ত নিজেরা জঙ্গল কাটতে কাটতে পথ তৈরী করতে লাগল। এমন উৎরাইতে এল যে, সারাদিন ধ'রে অন্ধকারেই তাদের পথ চলতে হ'ল। রাত্রের দিকে গাছের তলায় তারা আশ্রয় নেয়, নর-খাদকের ভয়ে আগুন জ্বালাতে না পেরে শীতে তারা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপে। ওর মধ্যে আবার আছে সহস্র সহস্র বিষাক্ত ডাঁশের আক্রমণ। এইভাবে ক্লান্তদেহে দিনের পর দিন তারা চলতে লাগল।

অরণ্যের ভিতরে অল্পে অল্পে যখন রাত্রির ছায়া নামতে থাকে, ডনের বন্ধুরা যেন দেখতে পায় তাদের ঠাকুমাদের কাছে শোনা রূপ-কথার শত শত প্রেতমূর্তি গাছের ডালে-ডালে ঘুরে তাদের যেন অবরোধ করছে,—চারিদিকে যেন ভয়ঙ্করের করাল ছায়া। আবার দেখা যায়, সহসা সেই অরণ্য যেন আপন ভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে! বানরের চীৎকারে, বন্য জানোয়ারের গর্জনে, মানুষ-মারা পাখীর বিকৃত আওয়াজে এবং বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র বাদুড় আর রক্তলোভাতুর মশার ডাকে সেই অরণ্য পরিপূর্ণ। অথচ এই অরণ্য ও নদী এড়িয়ে তাদের কোথাও যাবার উপায় ছিল না। এই পথে কোথায় কি আছে, কোন্ দেশে রাজ্য, কোন্ নদীর পর কোন্ নদী—এ সমস্ত খবর তাদের কাছে অজ্ঞাত। তারা শুধু দেখতে পাচ্ছে, কেবল নদীর পর নদী আর জঙ্গলের পর জঙ্গল। কিন্তু এগিয়ে তাদের যেতেই হবে, মৃত্যু তাদের সামনে যত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েই আসুক না কেন তারা কিছুতেই ফিরে যাবে না।

সতর্ক চক্ষু চারিদিকে মেলে তারা এগিয়ে চলেছে। ভয় ছিল, পাছে নর-খাদকদের বিষাক্ত তীর জঙ্গল ভেদ ক'রে এসে তাদের শরীর বিদ্ধ করে, কিংবা গাছের উপর থেকে তাদের ঘাড়ে প্যান্থর লাফিয়ে পড়ে। চলতে চলতে তাদের জামা-কাপড়ে এমন সব ভয়ানক পিঁপড়ের দল ঢুকে পড়তে থাকে যে, তাদের দংশনে মনে হয় জ্বলন্ত লোহার ছুঁচ তাদের শরীরে বিঁধিয়ে দিয়েছে। বন্য বাদুড় হাত-পায়ের আঙুল ও কান কেটে নেবার চেষ্টা করে। এ ছাড়া লতা-পাতার কুৎসিত গন্ধে বমি আসে। এমনি ক'রে একমাস কেটে গেল।

নদীর ধারে এসে কাঠকুটো সংগ্রহ ক'রে তারা সব বন্ধু মিলে একটি ভেলা বানাল। আহারের সংস্থান হ'ল বুনো কলা। নদীতে মাছ প্রচুর, কিন্তু ছিপ অথবা জাল কিছুই সঙ্গে নেই—তা ছাড়া সেটা হ'ল বন্যার কাল।

বন্যার ধাক্কায় একদিন হঠাৎ তাদের ভেলাটি গেল ভেঙে, ঢেউয়ের আবর্তে পাক খেয়ে সেই ভেলাটা কোথায় হারিয়ে গেল। সেই বিপদের মধ্যে কাঠের তক্তা আঁকড়ে ধ'রে বীর বালকের দল স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধে মাতল। সাঁতার তারা জানত না, সুতরাং হাত ছেড়ে গেলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে রাত্রি প্রভাত হ'লে তারা দেখল, তীর-ভূমিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে তারা প'ড়ে রয়েছে। এমন সময় দূরে একদল বর্বর শাল্‌তি বেয়ে যাবার পথে সহসা তাদের লক্ষ্য ক'রে বন্য ভাষায় চীৎকার ক'রে উঠল এবং দেখতে দেখতে কয়েকটা সাংঘাতিক বিষ-মাখানো তীর তাদের দিকে ছুটে এল। কি ভাগ্য, একটিও ওদের গায়ে লাগল না। ওরা দৈবাৎ বেঁচে গেল।

এই নর-খাদকের দল চিরকাল উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। কালো তামার মতো তাদের গায়ের রং। মুখ, ঠোঁট ও চোখ রক্তের মতো লাল। তাদের হাতে যে বর্শাগুলি থাকে সেগুলির আগায় মারাত্মক

বিষ মাখানো। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অতি কঠিন। কিন্তু ডনের দল অতি কৌশলে তাদের চোখ এড়িয়ে অবশেষে অনেক দিনের পর এক বিস্তীর্ণ ও গভীর নদীর উপরে এসে উত্তীর্ণ হল। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, পরিশ্রমে ও অনাহারে তারা অবসন্ন সেই আটটি ক্ষুধার্ত বালক একদিন ঈশ্বরের দিকে চেয়ে বললে, পরাজয় স্বীকার করব না, তার চেয়ে বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব। তাদের সামনে পথের কোনো দিশা নেই, সীমা নেই, সৌভাগ্যের সঙ্কেত নেই, কেবল আছে তাদের বজ্র-কঠিন প্রাণ। তারা পিছন দিকে না তাকিয়ে আবার ভেলা তৈরী ক'রে নদীর স্রোতে ভেসে যায়। জানি না, আকাশ-পথে সেদিন ঈশ্বর তাদের স্নেহাশীর্বাদ করেছিলেন কিনা। ভেলা থামিয়ে ঘুমোতে গেলে বন্য মাছি তাদের আক্রমণ করে, পতঙ্গের দংশনে শরীরের রক্ত জ্ব'লে ওঠে, দেখতে দেখতে গায়ের চামড়ায় ঘা হয়। কোনো দিন হয়ত কোথাও তারা বুনো কলাগাছ দেখতে পেলে। ভেলা থামিয়ে অমনি তারা ছুটল নদীর পাড় বেয়ে লুব্ধ উন্মত্ত আটটি প্রাণী বন্য জন্তুর মতো সেগুলি পলকের মধ্যে গ্রাস করল।

একবার একদল জংলী তাদের আক্রমণ করল। ওরা সবাই পালাতে পেরেছিল বটে, কিন্তু একজন বর্শার আঘাতে আহত হয়েছিল। সেবার সে বেঁচে গেল এই যা রক্ষে। কিছুকাল পরে আবার একদল নর-খাদককে তারা দেখতে পেয়েছিল। তারা যেন একটু ভদ্র মনে হল। অর্থাৎ তরুণের দলকে দেখে তারা গা ঢাকা দিল। ডনের দল তাদের জন্য নদীর ধারে কিছু উপহার রেখে দিয়ে অন্তরালে রইল। সেই জংলীরা ফিরে এসে সেগুলি পেয়ে খুশী হল। তাদের সঙ্গে ভাব ক'রে ডন্ একখানা শাল্‌তি নৌকা সংগ্রহ করল। খাদ্য না হ'লেও চলবে, কিন্তু এই শাল্‌তিটি সকলের

আগে দরকার। উপবাসী তরুণের দল সেই শাল্‌তি নিয়ে এবার অগাধ নদীর স্রোতে হু-হু ক'রে ভেসে চললো।

ডনের নৌকা চলেছে। শত শত মাইল নদী-পথ। কত দুঃখ, কষ্ট, আঘাত, অনাহার। কিন্তু অদম্য পিপাসা নিয়ে তারা চলেছে। এমনি ক'রে পাঁচশো মাইল নদী-পথ পেরিয়ে তারা আমেজনের প্রধান শাখা বেণীনদীর সঙ্গমে এসে উত্তীর্ণ হল। এর আগে আর কেউ কোনদিন এই নদী অতিক্রম করে নি। কত পর্বত-কন্দর, কত সানুদেশ, কত জটিল জটাপথ, কত হিংস্র মানুষ ও পশুর আক্রমণ—কিন্তু সমস্ত অস্বীকার ক'রে ডনের দল এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে তারা বিশাল আমেজনের বিপুল প্রবাহের সুদূর কল্লোল শুনতে পেল। পথের দুর্যোগকে তারা জয় ক'রে এনেছে, এবার 'মাদেরা' নদী পেরিয়ে আমেজনের তীরে উঠলেই তারা আহার ও বিশ্রাম পাবে।

সুন্দর আকাশ, নীল অরণ্য, নদীর অথৈ জলরাশি যেন তাদের এই বিজয়গৌরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে! এবার দুর্ভাগ্য তাদের শেষ হয়ে এসেছে। হে ঈশ্বর, তোমাকে প্রণাম!

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ডন্ দেখল, বেণীনদীর এপার থেকে ওপার অবধি একটা প্রকাণ্ড বাধা। এই বাধা হ'ল বেণীনদীর বান। আশ-পাশের পার্বত্য জলস্রোতের ভীষণ আঘাত, তরঙ্গদল আকাশ অবধি উঁচুতে উঠে ভেঙে পড়ছে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তারা অতি দ্রুত শাল্‌তি নিয়ে এল নদীর তীরে। শরীর তাদের দুর্বল, জ্বরজ্বর ভাব, মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য, পতঙ্গ-দলের দংশন—কিন্তু তারা হতাশ হ'ল না। বিপদ্‌কে তারা জয় করবেই। এক সময় আবার তারা যাত্রা করল, এবং কিছুক্ষণ পরে দূরে আমেজনকে দেখে তারা জয়ের আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল।

হায়, কিন্তু ভাগ্যের কুটিল কটাক্ষ! জলের নীচে পাহাড়ের

চোরাগুহার ভয়ঙ্কর আবর্ত তারা কেউ লক্ষ্য করেনি। সহসা তাদের শাল্তিটি খরস্রোতে ঘূরপাক খেয়ে পাহাড়ের কানায় আঘাত করল সাংঘাতিক ভাবে। এবার সেই ভয়াবহ ক্ষুব্ধ জলস্রোত আর তাদের ক্ষমা করল না। সেই স্রোত সবাইকে আছাড় মেরে নদীর তলায় তলিয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে সবাই নিশ্চিহ্ন! কিন্তু দেখা গেল, মাত্র দু'টি বালক জলের ধাক্কায় পাহাড়ের কিনারা আঁকড়ে ধ'রে কোনমতে প্রাণ রক্ষা করেছে। আর বাকি ছ'জন—ডন্ সমেত—সেই অনন্ত জলরাশির রাক্ষসী গ্রাসের অতল তলে চিরদিনের মতো তলিয়ে গেছে।

সেই নিরুপায় বন্ধু দু'টি পাহাড়ের কিনারায় আত্মরক্ষা ক'রে ব'সে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল তাদের দলপতি ডনের জন্য, অন্যান্য সঙ্গীদের জন্য। বীরের প্রাণের বিনিময়ে অভিযান তাদের সার্থক হ'ল কয়েকজন ব্রেজিলবাসী সেই বন্ধু দু'টিকে দেখতে পেয়ে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেল অসীম সমাদরে!

কিন্তু ডন্? সে আজ কোথায়? তার গৌরব আজ কে নেবে? প্রাণ দিয়ে গেল সে একটি নূতন মানচিত্রের জন্য—তার কীর্তির পদতলে নমস্কার। আজ ডনের আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে নূতন সভ্যতার আনা-গোনা চলছে।

ডন্ বেঁচে নেই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পেরুবাসীর অন্তরের মন্দিরে সে প্রতিষ্ঠিত। তার মৃত্যু নেই।

ব্রেজিলের অরণ্যপথ

জগদ্বিখ্যাত ভ্রমণবীর যাঁরা, তাঁদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকা আজও অনন্ত রহস্য দিয়ে ঘেরা। ঘরে যাদের মন বসে না, যারা কোনো আরামের লোভে বশীভূত হয় না, সেই সব লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারার দল আজও ছুটে যায় সেই পথে, যে-পথে আছে দুঃখ যন্ত্রণা, উৎপীড়ন আর মৃত্যুভয়। এই রকম একটি বিপদসঙ্কুল ভূভাগ হ'ল দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট প্রদেশ ব্রেজিলের অরণ্য-পথ।

এই ভয়াবহ অরণ্য-পথে কত বীরের মৃত্যু ঘটেছে, কত বীর পথ হারিয়ে চিরকালের মতন অদৃশ্য হয়ে গেছে, অসভ্য জাতির আক্রমণে কত দুঃসাহসীর বুকে বর্শার ফলক বিদ্ধ হয়েছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু তবু মানুষ কোনোদিন থেমে নেই— তারা দুঃসাধ্য অভিযানের পথে ভয়হীন প্রাণ নিয়ে এগিয়ে গেছে, সকল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও প্রচণ্ড অধ্যবসায় নিয়ে তারা দুর্গমকে জয় করতে চলেছে।

ব্রেজিল প্রদেশ এত বিরাট যে, এর মানচিত্র আজও নির্ভুলভাবে প্রস্তুত হ'তে পারেনি। আদি-অন্তহীন বিশাল অরণ্য কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় তার শেষ, এখনও তার হিসাব পাওয়া কঠিন। পর্বতমালার জটিল জটলা, দুর্ভেদ্য অরণ্যানী, অগণ্য খরস্রোতা নদ ও নদী, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, ভয়াবহ কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ,—সমস্তটা মিলিয়ে অভিযাত্রী দলের কাছে সমগ্র ব্রেজিল আজও প্রায় দুরতিক্রম্য হয়ে রয়েছে। এই বিশাল ব্রেজিলের ভিতর দিয়ে যে

খরস্রোতা মহানদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই নদীর নাম ভূগোলের যে-কোনো ছাত্রই জানে, তার নাম আমেজন্। এই নদী থেকে যে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সমগ্র ব্রেজিলের মর্মে-মর্মে বয়ে চলেছে সেই এক-একটি শাখাই এক-একটি বিরাট নদী ব'লে পরিচিত।

আমেজন্ নদীর মূল প্রবাহ খুঁজে বা'র করতে পাশ্চাত্য দুঃসাহসীদের অনেক কাল লেগেছিল। নদীর এই শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ শিরা-উপশিরার উভয় তীরের ভূভাগগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক এও সবাই জানত। এখনও, এই বৈজ্ঞানিক যুগেও, ব্রেজিলের সেই সব অঞ্চলে সভ্যতার লেশমাত্র চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। বড়-বড় দু-চারটি আশপাশের শহর ছাড়া সমগ্র ব্রেজিল আজও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তা' ছাড়া, প্রাকৃতিক কারণে সমগ্র ব্রেজিলব্যাপী এমন একটি আবহাওয়া রয়েছে যে, নিরাপদে ওর কোনো অংশেই বিচরণ করা সহজ নয়। ঝড়ের আক্রমণ, বজ্রাঘাতের প্রচণ্ডতা বারিবর্ষণের মুষলধারা, আকস্মিক বন্যা ও প্লাবন, অরণ্যে-অরণ্যে দাবানল,—এ সমস্ত ঘটনা প্রায় অবিশ্রান্ত। এ ছাড়া, প্রত্যেক জলাশয়ে হাঙ্গর-কুমীর ইত্যাদি হিংস্র জল-জন্তুর বাসা,—স্থলভাগের সর্বত্রই নরখাদক জানোয়ারের আনাগোনা, গাছে-গাছে আক্রমণশীল বড় বড় পাখী ও সাপ, জঙ্গলে বন্য মশা ও বিষাক্ত সরীসৃপ, ঝোপে-ঝাড়ে সর্বত্র হিংস্র কীট ও পতঙ্গে পরিপূর্ণ।

সর্বপ্রকার উৎপাতের পরেও আর একটি প্রধান দুশ্চিন্তা,—অসভ্য ও আদিম অধিবাসীদের দলবদ্ধভাবে আকস্মিক আক্রমণ। তাদের বিষাক্ত বর্শার ফলক যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দিক থেকে এবং যে-কোনো ব্যক্তির শরীরে ছুটে এসে বিদ্ধ হ'তে পারে। এই সমস্ত বিচার ক'রে দেখতে গেলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভ্রমণের উপায় হ'ল জলপথে কোনো প্রকারে অগ্রসর হওয়া। ঝড়, বৃষ্টি,

জলের আঘাত, কুমীরের তাড়না, বন্য মাছি ও মশার আক্রমণ এসব সত্ত্বেও কতকটা নিরাপদ হ'ল জলযাত্রা।

ডাঃ এডুইন হেথ্ নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার একবার ওখানকার নদীপথ ধ'রে বহু কষ্টে যাত্রা করেন। ভয়াবহ বিপদ ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত এড়িয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। তারপর কয়েকজন ইংরেজ সেই পথে যেতে চেষ্টা করেন। তাঁরা হলেন ডাঃ হ্যামিল্টন রাইস্, স্প্রুস্, ওয়ালেস এবং বেট্স্। এই দুঃসাহসিক অভিযানে যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ করেন, তাঁর নাম হোলো কর্ণেল ফসেট্। কিন্তু কর্ণেল ফসেট্কে তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণাম স্বীকার ক'রে নিতে হয়। সেই কাহিনী রোমাঞ্চকর।

বিগত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেজন্ নদীর পথ ধ'রে কর্ণেল ফসেট্ অগ্রসর হন। সঙ্গে তাঁর পুত্র এবং অপর একজন ইংরেজ সঙ্গী ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত অজানা রহস্যের উদ্ঘাটন ক'রে তবে ফিরবেন। কিন্তু তাঁদের নিয়তির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ,—কেননা আর কোনোদিনই তাঁরা ফিরে আসেন নি। অনেকের ধারণা, তাঁরা বন্য বর্বর জাতির হাতে প্রাণ দিয়েছেন; আবার অনেকে মনে করেন, তাঁরা অবণ্যলোকের বিষাক্ত জ্বর এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিস্তার পান নি। সেই ঘটনার তিন বছর পরে জর্জ দায়ৎ নামক এক ভদ্রলোক বহু অনুসন্ধানের পর এমন সব চিহ্ন খুঁজে পান যাতে বুঝতে পারা যায়, ফসেট্ সাহেবের দল বন্য বর্বরের হাতেই নিহত হয়েছিলেন।

ফসেট্ কেবল যে অনর্থকই দুঃসাহসের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তা' নয়। তিনি বলিভিয়া রাজ্যের সীমা-নির্দেশকারী কমিশনের কাজে ওখানে যান। ও-অঞ্চল ছিল তাঁর অনেকটা পরিচিত; কারণ, তার বছর পনেরো আগেও আর একবার তিনি ও-দিকে

গিয়েছিলেন। অরণ্যলোক অতিক্রম করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর—সকল কাজেই তিনি ছিলেন উৎসাহী। তা' ছাড়া বিষাক্ত জ্বর তাঁকে স্পর্শ করত না, অপরিসীম সাহস ছিল তাঁর,—বন্য জাতিকে তিনি ভুলিয়ে রাখতে পারতেন। একদিকে তিনি যেমন কৌশলী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর ছিল পরিহাস-বুদ্ধি।

কি প্রকার ঘটনাচক্রের মধ্যে প'ড়ে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যু ঘটে, সেটি এখনও রহস্যাবৃত; কিন্তু বন্যজাতির সম্বন্ধে তাঁর প্রথম-বারের অভিজ্ঞতা কিরূপ, সেই কাহিনী অনেকের কাছেই পরিচিত।

পেরু ও বলিভিয়ার অসভ্য জাতি দু'টির মধ্যে রাজ্যের সীমারেখা নিয়ে কলহ লেগে থাকত নিত্য নিয়মিত। এই সীমা-রেখায় আছে এক নদী। নদীটি সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র। ওই নদীপথের দুই পারে এক আদিম বন্যজাতির বাসভূমি আজও আছে—তাদের নাম গুয়েরেয়ো—তারা নরহন্তা এবং নরখাদক দুই-ই। কিন্তু ওই নদীপথ ধ'রে অগ্রসর হয়ে যদি কেউ তাদের বিনা অনুমতিতে তাদের এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। উন্মত্ত হিংস্রতার সঙ্গে চারিদিক থেকে তারা আক্রমণ করবে। সে-আক্রমণের প্রতিরোধ করা এই বৈজ্ঞানিক যুগেও অতীব কঠিন এবং সেই কারণেই প্রত্যেকটি অভিযান বার-বার ব্যর্থ হয়ে এসেছে। সীমা-নির্দেশকারী কমিশনের সর্বপ্রধান কাজই হ'ল, নিরপেক্ষভাবে এই অঞ্চলের মানচিত্র প্রস্তুত করা, এবং এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্যই ফসেট্ সাহেব সেবার গুয়েরেয়োদেরকে না জানিয়েই নদীপথে অগ্রসর হন।

জলপথে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বেশ নির্বিবাদেই কেটে গেল। ফসেট্ সাহেব স্থানীয় সাহায্যকারীদের গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, একটি ছোট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ইংরেজ দল যে-কোনো স্থানে যে-কোনো বিপদ কাটিয়ে প্রবেশ করতে সমর্থ। তাঁরা সবশুদ্ধ ছিলেন ছয়জন ইংরেজ এবং একজন বলিভিয় ক্যাপ্টেন। সঙ্গে ছিল তিনখানা ছিপ নৌকা এবং প্রচুর খাদ্য-সম্ভার। সমস্ত রাত্রিব্যাপী মশা, পতঙ্গ ও বাদুড়ের আক্রমণ সত্ত্বেও তাঁরা নিরাপদে এগিয়ে যান। তারপর নদীর এক বাঁকে সহসা অগ্রবর্তী নৌকার আরোহীরা দূরে বন্যজাতির একটি নতুন তাঁবু লক্ষ্য করেন। নদী সেখানে সঙ্কীর্ণ—তারই বালুময় কিনারায় সেই আরণ্যকের দল গাছের ডালপালা দিয়ে তাঁবু বানিয়েছে এবং তারই কাছাকাছি বেঁধে রেখেছে খান-পনেরো ছিপ আর শাল্‌তি। তাঁবুর এক খুঁটিতে একটি বানর বাঁধা রয়েছে,—বানর ওদের প্রিয় জন্তু। ফসেট্ এবং তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে অসভ্য লোকগুলি তাঁবুর পল্লীটি ত্যাগ ক'রে নদীর অপর পারে গিয়ে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে— দেখা গেল। ওদের উদ্দেশ্য মন্দ—পলকের মধ্যেই ফসেট্ তা' জানতে পারলেন।

কয়েকটা কুকুর ডাকছে, কয়েকজন স্ত্রীলোক চীৎকার করছে, পুরুষরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হাঁক দিচ্ছে,—তৎসত্ত্বেও ফসেট্ নির্ভয়ে ছিপ নৌকা নিয়ে পারঘাটার কাছে এলেন। আসামাত্রই বন্য বর্বরের দল গা ঢাকা দিল,—লক্ষণটি মোটেই ভালো নয়। ফসেটের দ্বিতীয় ছিপ নৌকাটি এসে পৌঁছামাত্রই কোথা থেকে ধনুকের একটি তীর ছুটে এসে নৌকায় বিদ্ধ হ'ল; প্রায় দেড় ইঞ্চি কাঠের ভিতরে সেই তীর ঢুকে গেল। তারপরে আর বিরতি নেই—অবিশ্রান্ত তীরবর্ষণ—এদিক থেকে বন্দুকের গুলীর আওয়াজ,—এবং এই হৈ-চৈ অবস্থার মধ্যে ফসেট্ সাহেবের তৃতীয় নৌকাটিও এসে পৌঁছল।

দেখতে-দেখতে অবস্থাটা মন্দের দিকে এগিয়ে গেল। একটি মুহূর্তের ভুল অথবা একটি পলকের অসতর্কতা ঘটলে, আত্মরক্ষা

করবার কোনো উপায় আর থাকবে না, ফসেট্ একথা জানতেন। ধনুকের একটি তীর অথবা বর্শার একটি আঘাত যে কী সাংঘাতিক, তাও ফসেটের জানা ছিল। একবার অপর একটি নদীপথে জনৈক ইংরেজ এই প্রকার একটি বর্শার আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। বর্শাটি এসে লাগে এক পাশ থেকে এবং সেই ভদ্রলোকের একখানি বাহুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে এবং অপর বাহুখানি ভেদ ক'রে গিয়ে সেটি তাঁর নৌকার পাটাতনে বিদ্ধ হয়ে যায়। পাটাতনের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের মৃতদেহ বিদ্ধ হয়ে থাকে।

ফসেট্ সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন, এই সংঘর্ষের মধ্যে নেমে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার অর্থ-ই হ'ল, তাঁদের নিজেদের বিনাশকে ডেকে আনা। গুয়েরেয়ো ভাষার কয়েকটি শব্দ তিনি এদিকে আসার সময় মুখস্থ ক'রে এসেছিলেন,—কিন্তু এই সংঘর্ষের মধ্যে প'ড়ে সেই ভাষাটুকু ব্যবহারের কোনো সুবিধাই পাওয়া গেল না; বন্ধুর মতো অঙ্গভঙ্গী ক'রে তাদের দিকে সহাস্যে দুই হাত প্রসারিত ক'রে রইলেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হ'ল না। তাঁদের কাছে সঙ্গীতের একটি বাদ্যযন্ত্র ছিল,—ও অঞ্চলে যে সুরটি সাধারণতঃ প্রচলিত, ফসেট্ সাহেব সেই বাদ্যযন্ত্রে ওই সুরটি ধ্বনিত ক'রে তুললেন,—কিন্তু তাতেও অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হ'ল না। বরং এরপর ধারালো শরগুলি এমন অশ্রান্তভাবে এসে পড়তে লাগল যে, মনে হ'ল সমগ্র অঞ্চলটায় ওগুলি কে যেন সরু-সরু চারাগাছের মতো পুঁতে রেখেছে! প্রত্যেক শরের অগ্রভাগে কাঁটা দেওয়া, সমস্তটা মিলিয়ে সাত-আট ফুট লম্বা, এবং পিছন দিকে পাখীর পালক এমন ভাবে আটকানো যা'তে ক'রে ওই দীর্ঘ অস্ত্রটি ঋজুভাবে ছুটে এসে লক্ষ্যবস্তুতে বিদ্ধ হয়। আরো ভয়ের কথা এই, একবার বিদ্ধ হয়ে গেলে, সেই অস্ত্র শরীর থেকে টেনে বের করা

সম্ভব নয়। সেইজন্য অস্ত্রোপচার করা দরকার। যাই হোক, উপস্থিত বুদ্ধি ও সতর্কতার জন্য ফসেটের দলের কেউই আহত হলেন না। কেবল শত্রুদলের সেই বানরটি একটি তীরের আঘাতে মারা গেল।

কিন্তু এভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা দীর্ঘকাল সম্ভব নয়! ফসেট্ সাহেব নদীর ধার দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়ে গেলেন। অস্পষ্ট ও জড়িতভাবে তিনি গুয়েরেয়ো ভাষার কথাগুলি চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে ওরা তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। এইভাবে তাঁকে দূর থেকে একটা অসীম সাহসের সঙ্গে আসতে দেখে বর্বরের দল হঠাৎ যেন একটু বিস্ময়াভিভূত হয়,—তারা তাদের শরনিক্ষেপ বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পর সেই আদিম অধিবাসীর দল তাঁর দিকে এগিয়ে এল এবং তাঁকে নিজেদের এলাকার মধ্যে জঙ্গল পেরিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গীরা তাঁর এই দুঃসাহসে বিমূঢ় স্তব্ধ হয়ে রইল।

অরণ্যের ভিতর দিয়ে ফসেট্‌কে ওরা নিয়ে চলেছে, কোথায় নিয়ে চলেছে কিছু জানা নেই। ফসেট্‌কে ঘেরাও করেছে আরণ্যক জনতা,—গহন বনের ভিতর দিয়ে তারা ফসেট্‌কে নিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। ফসেটের সঙ্গীরা আনন্দে কণ্টকিত। নদীর ধার বরং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কিন্তু এই ভাবে শত্রুর কবলের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া যে কিরূপ ভয়াবহ, তা অনুমান করতেও শরীর হিম হয়ে আসে!

কিন্তু ফসেট্ সেবার বিজয়ী-বীরের মতোই অরণ্যপথ থেকে বেরিয়ে আসেন। কতক্ষণ অধীর প্রতীক্ষার পর তাঁর বন্ধুরা লক্ষ্য করেন, জঙ্গলের ভিতর থেকে সহাস্য কলরব করতে-করতে একদল গুয়েরেয়ো লোকের সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসছেন। ওদের মধ্যে যে লোকটা দলপতি,—তার ছেলের মাথায় ফসেটের টুপিটি শোভা পাচ্ছে। সকলেই হাসি-খুশী!

বিপদকালে শান্ত বিচার-বুদ্ধি, শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে নির্ভুল আত্মীয়তার নিদর্শন, উপস্থিত চিন্তাবৃত্তির প্রখরতা—এগুলি থাকা একান্ত দরকার। আমেজন্ নদীর পারিপার্শ্বিক অরণ্যলোকে যারা অভিযান করতে যাবে—তাদের কখনো কোনো ভ্রান্তি ঘটলে আর নিস্তার নেই।

কত শতাব্দী ধ'রে বর্বর নরহন্তার দল ব্রেজিলের অরণ্য অধিকার ক'রে রয়েছে বলা কঠিন,—আরো কত শতাব্দী অবধি থাকবে, তাও অজ্ঞাত।

রামধনুর দেশে

পৃথিবী আগে ছিল মস্ত বড়—তার আদি-অন্ত ছিল না। এ-যুগে উড়োজাহাজের কৃপায় জানা গেছে পৃথিবী এমন-কিছু বড় নয়, মাত্র সাত দিনে পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ করা যায়। তা ছাড়া গত মহাযুদ্ধে দেখা গেল, মানুষের অসাধ্যও যেমন আর কিছু নেই, তেমনি দুর্গম বলেও আর কিছু এর পরে থাকবে না। জার্মানী থেকে বোমা গিয়ে পড়ে ইংলণ্ডে, জাপানের বোমা গিয়ে পড়ে আমেরিকায়। মানুষের বুদ্ধি আর গবেষণা দূরত্ব আর দুর্গমকে জয় করার জন্য যুগ-যুগান্তর থেকে সাধনা ক'রে চলেছে। বর্তমান যুগে হাইড্রোজেন বোমা, এ্যাটম বোমা প্রভৃতির আবিষ্কার সেই সাধনার ফল।

এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজকাল পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর ও অভিনব বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেটির নাম 'আণবিক বোমা'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দু'টি মাত্র আণবিক বোমা ফেলে জাপানের দু'টি বিরাট শহরের অধিকাংশকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। আণবিক শক্তির প্রলয়ঙ্কর ধ্বংশ-শক্তির চেহারা দেখে আজ পৃথিবীর মানব-সমাজ মূঢ়, ভয়ার্ত ও অভিভূত। কিন্তু এই আণবিক শক্তি যদি কোনোদিন মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো হয়, সেদিনও পৃথিবীর লোক বিস্ময়াবিষ্ট হবে। ধরো, যে দেশে বৃষ্টি হচ্ছে না, সেখানে মেঘ উড়িয়ে এনে কৃত্রিম শৈত্যের সাহায্যে বৃষ্টি নামানো হবে। হয়ত পৃথিবীতে কঠিন ব্যাধি নামক কিছু থাকবে না,—কারণ মানুষের শরীরের বীজাণুকে পরিবর্তন ক'রে দেওয়া যাবে। যে কারণে

মানুষের মৃত্যু ঘটে, হয়ত সেই মৃত্যুর কারণটিকে লোপ করাও একদিন সম্ভব হবে। এসব ছাড়াও বৈজ্ঞানিকরা নাকি এই আণবিক শক্তি দিয়ে এমন সব জিনিস আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন, যার ফলে এই বিশ্বসৃষ্টির সকল রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে! অনেকেই বলছে, এতদিন পরে জ্যোতিষ্কলোকে যাওয়া মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য হ'ল।

সুতরাং গত ছয় বছরের সর্বগ্রাসী ও প্রলয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম নিরীহ মানুষের সমাজে যে দুঃখ, ব্যথা ও মৃত্যু ঢেলে দিয়ে গেল,—এই আণবিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে হয়ত সেই বিয়োগান্ত নাটকের ভিতর থেকে একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দেবে।

কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার যত বড়ই হোক, সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের পিপাসা কোনো যুগে বদলাবে কিনা এখনও বলা কঠিন। আমরা আজও বিরাট হিমালয় দেখে যেমন অভিভূত হই, বিশাল সমুদ্র দেখে তেমনি স্তব্ধ হয়ে থাকি। কোথায় সুন্দর পারিজাত-কানন, কোথায় আগ্নেয়গিরির আশ্চর্য দৃশ্য, কোথায় অগাধ সাগরের মাঝখানে রক্তপ্রবাল দ্বীপের পুষ্পোদ্যান—এগুলি আমাদের কাছে আজও অপরূপ। আজ এমনি একটি দৃশ্যের বর্ণনা করব।

সেটি হ'ল আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এই বিরাট জলপ্রপাত যে ভূভাগটির সম্পদ—সেই ভূভাগের নাম হ'ল রামধনুর দেশ। সেখানকার আকাশ আর শূন্যলোক চিরদিন রামধনুর বিচিত্র বর্ণসজ্জায় ভ'রে থাকে। সূর্যের আলোর সঙ্গে বায়ুস্তর আর জলকণার মিশ্রণে সেই রামধনুগুলি পলকে-পলকে নতুন আকার ধারণ করতে থাকে। ঠিক যেন মনে হয় শূন্যলোকে আকাশের দেবতারা নেমে এসে শত-শত ধনুর্বাণ নিয়ে নিঃশব্দে তীর ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন এবং সেখানে একটি অস্থির চঞ্চল জয়-পরাজয়ের খেলা চলেছে।

সুদূর আফ্রিকার জাম্‌বেসি নদীর ধারে এই ভিক্‌টোরিয়া জলপ্রপাত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যিনি আবিষ্কার করেন, তিনি ইতিহাসের সেই সুবিখ্যাত মিশনারী ইংরেজ ডাঃ লিভিংস্টোন্‌। তাঁর আগে আর কোনো শ্বেতচর্মী আফ্রিকার এই ভূভাগে পদার্পণ করেন নি, অথবা এই প্রপাতও দেখেন নি। লিভিংস্টোন্‌ যাবার আগে আফ্রিকার স্থানীয় আদিবাসীরা এই জলপ্রপাতটিকে বলত, 'মসিওয়াটুনিয়া' অর্থাৎ সঙ্গীতময় ধূম্রজাল।

ডাঃ লিভিংস্টোন্‌ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ পরিব্রাজক। পৃথিবীতে তখনও ক্রীতদাস ব্যবসায়-প্রথা চলিত ছিল—লিভিংস্টোন্‌ স্বয়ং দুর্গম আফ্রিকায় গিয়ে দুরারোহ ও বিপজ্জনক অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ভ্রমণকালে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন—কত বিপদ, কত ভয়, কত উপবাস ও কত বিরোধিতা,—কিন্তু তাদেরই ভিতর দিয়ে এই অদম্য প্রাণ-সম্পন্ন ইংরেজটি একদিকে যেমন খৃষ্টধর্ম প্রচার করতেন, অন্যদিকে তেমনি দাস-ব্যবসায় প্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করতেন। তাঁর পক্ষে সর্বাপেক্ষা অসুবিধার কথা ছিল এই, আফ্রিকায় যারা ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে ব্যবসা চালাত, তারা অনেকেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান। লোভ ও লাভের জন্যই তারা এই কুকর্ম করত। তারা একজোট হয়ে অনেক সময়ে লিভিংস্টোনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাত, তাঁকে হত্যা করার ফন্দী আঁটত।

লিভিংস্টোন্‌ যখন আফ্রিকায় ভ্রমণ করতেন, তখন এ-যুগের মতো কোনো যানবাহন ছিল না। রেলপথ সেখানে নেই, মোটর নেই, ঘোড়ার গাড়ী নেই,—এবং সর্বাপেক্ষা বিপদের কথা, চলাচলের কোনো রাস্তাও নেই। হাজার-হাজার মাইলব্যাপী হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে-ভরা জঙ্গল ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। গাছের ফল বিষাক্ত, জলাশয়

দুষ্ট বীজাণুপূর্ণ। বড়-বড় নদী অগম্য এবং প্রবল ভাঙনধরা। চারিদিকে সিংহ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য জানোয়ার।

সভ্যতার চিহ্ন কোথাও নেই, সঙ্গী নেই—শুধু আরণ্যক হিংসাপরায়ণ আদিবাসীরা চারিদিক থেকে মাঝে-মাঝে শত্রুতা করে। একবার এক সময় ডাঃ লিভিংস্টোন্ এক বিশালকায় সিংহের কবলে পতিত হন। সিংহটি তাঁকে সহসা অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং তাঁকে পায়ের তলায় ফেলে তাঁর একটি বাহু চিবোতে থাকে,—তাঁর বাহুর হাড়ভাঙার শব্দ পর্যন্ত যেন বহুদূর থেকে শোনা যায়। তবে বিস্ময়ের কথা, হৈ-হট্টগোলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়ে যান। সেই থেকে তাঁর ভাগ্যের চাকা একটু ঘুরে দাঁড়ায়। এই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে দেবদূত বলে মনে করে এবং সেই থেকে সেই বর্বর অধিবাসীদের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পেতে থাকেন।

পরিব্রাজক লিভিংস্টোন্ অতঃপর আবার অভিযান সুরু করেন।

এবার এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের একটুখানি ব্যক্তিগত পরিচয় দেব। ভবিষ্যতে অনেক বড় হবে, এমন অনেক লোক নিতান্ত সামান্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে। একদা যে-ব্যক্তি ইংলণ্ড ও সমগ্র জগতে ‘সিংহ’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তরুণ বয়সে তিনি চরকায় সূতো কাটতেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তিনি ছাত্র ছিলেন এবং অনেকে জানত তিনি চিকিৎসকের পেশা নিয়ে যাবেন এখানে-ওখানে। কিন্তু পাস করার পর ঘটনাচক্রে গভর্ণমেণ্টের কাজের সহায়তার জন্য ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হয়—উদ্দেশ্য, সেখাকার কুরুমান অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় বেচুয়ানাদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা।

কুরুমান অঞ্চলে গিয়ে লিভিংস্টোন্ হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গীদের

ছেড়ে দিয়ে ছয়মাস ধ'রে সেখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে দিন যাপন করেন। তাদের সংস্কার, ভাষা, অভ্যাস, বিশ্বাস—এ-সমস্ত তিনি নিখুঁতভাবে জানতে চান—এবং ধীরে-ধীরে তাদের মধ্যে ধর্মোপদেশ প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এ-সকল কাজে লিপ্ত থা'কলেও তাঁর মন প'ড়ে থাকে ভ্রমণের দিকে—নতুন দেশকে জানবার, নতুন মানুষের সমাজকে বোঝবার এবং দুর্গমকে জয় করবার বাসনা তাঁর মনে নিত্য জাগরূক থাকত। সে-বাসনা এত তীব্র ও আন্তরিক যে, তিনি স্বদেশে ফিরবার নাম করতেন না।

প্রায় নয় বছর এইভাবে কাটিয়ে লিভিংস্টোন্ একদল তরুণ দুঃসাহসীকে নিয়ে আবার একদিন আফ্রিকার দুর্গম ভূভাগের দিকে অভিযান আরম্ভ করেন। পথ-ঘাট অতিশয় কষ্টসাধ্য—এবং তৃষ্ণার জল পেতে হ'লে আদিবাসীরা বালুমাটি দুই হাতে তুলে তবে নীচের থেকে জল বা'র করত। কোনো অস্ত্রদ্বারা মাটি অথবা বালু খোঁড়া তারা পাপ ব'লে মনে করে। জল সেই ভূভাগে ভারি দুষ্প্রাপ্য। দুর্গম আফ্রিকার ঠিক সেই মধ্যকেন্দ্র-ভূমিতে একদিন লিভিংস্টোনের দল দূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়াময় জলাশয় লক্ষ্য ক'রে যখন দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়—দেখা যায় সেটি একটি মরীচিকামাত্র। সেদিন ব্যর্থতার হতাশায় তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা নব-নব দেশ, নদী ও পর্বত ইত্যাদি আবিষ্কার করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তাঁদের রচিত মানচিত্র অনুসরণ ক'রে বহু ব্যবসায়ী ও অভিযানকারী সুবিধালাভ করেন। এর প্রায় দু'বছর পরে লিভিংস্টোন্ আফ্রিকার মধ্যভাগে জাম্‌বেসি নদী আবিষ্কার ক'রে পৃথিবী-বিখ্যাত হন।

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর এইভাবে তিনি অরণ্যে, পর্বতে, নদীতীরে এবং আদিবাসীদের বসতির আশেপাশে ভ্রমণ ক'রে বেড়ান।

অতঃপর যেদিন কেপ্‌টাউনে তিনি এসে উপস্থিত হন, সেদিন সভ্যজগতের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বদেশে ফেরবার কোনো মোহ অথবা লোভ তাঁকে বশীভূত করতে পারেনি,—তিনি কেপ্‌টাউন থেকে প্রয়োজনীয় কতকগুলি রসদ ও জ্যোতির্বিদ্যা আয়ত্ত করার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আবার তাঁর সেই ক্লান্তিকর যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। বেচুয়ানায় তাঁর সেই নির্জন আশ্রমটি তাঁকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।

এই সময় বুয়োর জাতি নানাবিধ উৎপাত করতে থাকে এবং বৃটিশের সঙ্গে তাদের এখানে-ওখানে সংঘর্ষ বাধে। মাঝখানে একটি চুক্তির ফলে যখন বৃটিশ প্রভাব সেখান থেকে প্রত্যাহার ক'রে নেওয়া হয়, সেই সময় সহসা একদিন বুয়োররা লিভিংস্টোনের ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে কতকগুলি লোককে হত্যা করে এবং তারপর তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুইশত ছেলে-মেয়েকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস ক'রে রাখে। তারা লিভিংস্টোনেয় ঘরবাড়ী নষ্ট করে, তাঁর লাইব্রেরী ধ্বংস করে, তাঁর ঔষধপত্র তচনচ ক'রে দেয় এবং তাঁর যথাসর্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে চ'লে যায়।

লিভিংস্টোন্‌ এতে পরাজয় স্বীকার করেন নি। তিনি অধিকতর উদ্যমে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার বিলাতে আসেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি যেন নতুন বেগে ফিরে আসে। তিনি আগে ছিলেন এক মিশনারী, কিন্তু এবার থেকে একজন পাকা অভিযানকারী হয়ে ওঠেন। কষ্টসাধ্য ভ্রমণ ও অভিযান—তিনি একা অসীম শক্তির সঙ্গে চালিয়ে যেতেন। তাঁর একমাত্র কল্পনা—অরণ্যের দুরূহ গহ্বরলোকে গিয়ে তিনি সভ্যতার আলো জ্বালাবেন। বুয়োরদের শক্রতা, জলহীন মরুভূমি, দাস-ব্যবসায়ী লোভী আরব দস্যু, জলাভূমির রোগ-বীজাণু এবং

দু'-কূলপ্লাবী নদীর ধারা, এরা ছিল তাঁর অভিযানের পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। কিন্তু তবু তিনি অগ্রসর হন এবং একে-একে ভূগোলের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আবিষ্কার করতে থাকেন। বিশাল হ্রদ, বিরাট জলপ্রপাত, অজানা পর্বতরাজি, অনাবিষ্কৃত নদ-নদী—এসব দেখতে-দেখতে তিনি চ'লে যান। আজ সমস্তই লিভিংস্টোনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সত্যি বলতে কি, মধ্য-আফ্রিকা ভূভাগটি যে ইউরোপের কাছে আজ এত পরিচিত, এ কেবল সেই আদর্শবাদী মিশনারীটির জন্যই। রোগে তিনি বিবশ, দুর্বলতায় শীর্ণ—তবু তিনি বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে এবং পথে-পথে ঘুরেছিলেন।

বহুদিন এইভাবে অতিবাহিত করার পর লিভিংস্টোন্ তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সার্থকতার পথে এগিয়ে আসেন। মধ্যদেশের দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যাবার পথে তাঁর একমাত্র চিন্তা হ'ল, যদি সমুদ্রের সঙ্গে কোনো একটা পথের যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই পথ খুঁজতে গিয়ে তিনি জগতের অন্যতম বিস্ময় আবিষ্কার করেন।

সেখানকার আদিম অধিবাসীরা কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না, তারা যেমনই নিস্পৃহ, তেমনি নিরাসক্ত। কিন্তু তারাই মধ্যে-মধ্যে লিভিংস্টোন্‌কে বলত, অমুক অঞ্চলে এক রকম ধোঁয়া দেখা যায়, কিন্তু সেই ধোঁয়ার ভিতরে কেমন যেন একটা সুরের ধ্বনি শোনা যায়! ব্যাপারটা কি, তা' তারা কিছু জানে না। লিভিংস্টোন্ সেই অঞ্চলে যাবার সুবিধা পেয়ে এবার সেখানকার তদন্ত আরম্ভ করেন।

প্রথম সেই বিরাট জলপ্রপাতের দৃশ্য-বর্ণনায় লিভিংস্টোন্ বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় দীর্ঘ বাষ্পোদ্গম—সেটা বাস্তবিকই

ধোঁয়ারই মতন। আফ্রিকায় যেমন মাঝে-মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের আগাছায় আগুন জ্বালানো হয়—ঠিক সেই রকম এই ধুমবাষ্প পাঁচ-ছয় মাইল দূর থেকে নজরে পড়ে। ধীরে ধীরে দেখা যায়, সর্বসমেত পাঁচটি দীর্ঘাকার বাষ্পের মণ্ডলী ওপর দিকে উঠে বাতাসের দিকে প্রবাহিত হয়,—সেগুলি যেন নীচের দিকে বিশ্রাম ক'রে রয়েছে বৃক্ষ-জটলার সীমারেখায়। ধূম্রমণ্ডলীর অগ্রভাগ মিশে গেছে মেঘের সঙ্গে। নীচের দিকে সেগুলো শাদা, ওপর দিকে ছায়াময় কালো, সুতরাং ধোঁয়ার মতন দেখা যায় বৈ কি!

লিভিংস্টোন অভিভূতের মতন ধীরে-ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। বিহঙ্গ-কাকলী গানের সঙ্গে দূরের সুরের ঝঙ্কার, রঙীন মেঘের দল, জলকণিকার সস্নেহ স্পর্শ—মনে হয়, তিনি যেন স্বর্গের পারিজাত-কাননের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

পারিপার্শ্বিক ভূভাগের সৌন্দর্য কী অপরূপ! নদীর দুই তীরে বৃক্ষলতাবিতান ও বিচিত্র সুন্দর সুগন্ধ ফুলের কী শোভা!—আর মাঝে-মাঝে সেই জাম্বেসি নদীর মাঝখানে ছোট-ছোট সুন্দর খেলা-ঘরের দ্বীপ। তিনি একটি ছোট নৌকাযোগে নদীর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকেন। ভাসতে-ভাসতে এক সময় সেই বিশাল জলপ্রপাতের ঠিক প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তিনি সেই জায়গার বর্ণনা ক'রে গেলেন, প্রায় আধ মাইল চওড়া একটি জলস্রোত প্রায় একশো ফিট উঁচু থেকে সেখানে দুরন্ত বেগে নেমে এসে সহসা একটি পনেরো-কুড়ি গজ নালার মধ্যে ঢুকে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে ছুটছে!

তাঁর সেই অভিভূত অবস্থা কেটে যাবার পর তিনি প্রথম দিন সেখান থেকে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিন আবার তার ধারে যান। এবার দেখলেন, জলপ্রপাতটি অন্তত এক মাইল চওড়া এবং সেটি

নামছে কম-সে-কম চারশো ফিট উঁচু থেকে এবং এক-একটি ফাটলের জল প্রায় একশো ফিট বিস্তৃত। সমস্ত জলধারাটা ত্রিশ-চল্লিশ গজ নালার ভিতর দিয়ে দৌড়য়—তারপর সেটি ক্রমশ বিস্তীর্ণ হয়ে নদী সৃষ্টি করে। সমস্তটাই সরীসৃপের মতন আঁকাবাঁকা, ঘোরাফেরা। যখন সেই জল আছড়ে পড়ে তখন সেটা শুভ্র তুষারের মতো ফেনার সৃষ্টি করে। চারিদিকে রক্তবর্ণ পর্বতের গাত্র একটি পটভূমিকার মতো দেখায়—এবং তাদেরই চতুষ্পার্শ্বে নীল সবুজ নানা বর্ণের বৃক্ষলতা ও শাকসব্জির অপরূপ সমারোহ! লাল, গোলাপী, ঘন লালাভ পীত —ইত্যাদি বর্ণের অফুরন্ত শোভাযাত্রা। লিভিংস্টোন্ এই মনোরম দৃশ্যের অবতারণা ক'রে বলেছেন, হয়ত অপ্সরী কিন্নরীরা এইখানে এসে বিচরণ ক'রে যায়!

একদিন লিভিংস্টোন্ সমুদ্রগামী পথ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর সেই আবিষ্কারের ফল হ'ল, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা সুবিধা পেয়ে সেই পথে ক্রীতদাস চালান দিতে লাগল। সেখানে দিকে-দিকে সেই ব্যবসায়ীদের অনাচার আর উৎপীড়নের চিহ্ন দেখে তিনি অতিশয় বেদনা বোধ করেন—তিনি নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হন।

এই প্রকার দুরবস্থা, তার ওপর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। মানুষের কল্যাণের কাজে এসে তিনি দেখেন, কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই প্রধান হয়ে উঠেছে। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক আঘাত পান, যেদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ জাম্বেসি নদীর তীরে সমাধিস্থ করেন। সুতরাং ভগ্নমনে তিনি সদলবলে আর একবার আফ্রিকা ত্যাগ করেন। আর কোথাও কোনো সুবিধা না পেয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব জাহাজখানি নিজের হাতে চালিয়ে ভারতের উপকূলে বোম্বাই বন্দরে নিয়ে আসেন। তখন সমুদ্রপথে অভিযান করার জন্য দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, ডাঃ লিভিংস্টোন্ আকাশের তারকা ও জ্যোতিষ্কলোকের গ্রহ-উপগ্রহ

বিচার ক'রে নির্ভুল পথে ভারত-সাগর পেরিয়ে আসেন।

পুনরায় তিনি বিলাত হয়ে আফ্রিকায় ফিরে যান, কারণ আফ্রিকার নিঃশব্দ আহ্বান তিনি ভুলতে পারেন নি। কিন্তু সেই তাঁর শেষ যাত্রা। দুর্ভাগ্য, বিপদ, উৎপীড়ন, দুর্যোগ—এসব তাঁকে ছাড়েনি, কিন্তু তাঁর অদম্য প্রাণ, অপরিমেয় অধ্যবসায়। এবারের অভিযানও তাঁর ঘটনাবহুল। কিন্তু এই সময় তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে।

সেটা বর্ষাকাল, চারিদিক স্যাঁতসেঁতে এবং জলে ডোবা—তার ওপর খাদ্য দুষ্প্রাপ্য। লিভিংস্টোনের অনুচরেরা বিধিমতে তাঁর সেবা ক'রে তাঁকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। তারা ডালপালা ও বাঁকারির সাহায্যে একটি খাট প্রস্তুত করে তাঁকে শোয়ায়, আর পাহারা দেয়। কিন্তু এই মহৎ জীবনের অন্তিমকাল তখন ঘনিয়ে এসেছিল। অবশেষে একদিন শেষরাত্রি চারটের সময় তাঁর একটি সেবক উঠে দেখে, লিভিংস্টোন্ সেই বিছানার ওপর উপুড় হয়ে হাত দুটি জোড় ক'রে প্রার্থনার ভঙ্গীতে প'ড়ে আছেন, কিন্তু তখন তিনি পরলোকগত।

আফ্রিকার সেই দুর্গম অরণ্যলোকে লিভিংস্টোনের সমাধি এখনও রয়েছে একটি গাছের তলায়—সমগ্র আফ্রিকা সকৃতজ্ঞ আনন্দ-বেদনায় তাঁর সমাধির কাছে এখনো এসে দাঁড়ায়। তাঁর হৃদয় ওখানকার মাটির নীচে আজও প্রোথিত রয়েছে।

লিভিংস্টোনের নশ্বর দেহ গেছে ইংলণ্ডে। কিন্তু সেই দেহ—শুধু আত্মাহীন দেহ। তাঁর সত্তার পরম প্রকাশ রয়ে গেছে সুদূর আফ্রিকার সমগ্র আকাশে-বাতাসে।

গ্রীণল্যাণ্ডের মেরুপথে

গ্রীনল্যাণ্ডের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। যারা শোনোনি, তারা মানচিত্র খোলো। আতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে চ'লে যাও—কানাডা রাজ্য অতিক্রম ক'রে যাও আরো উত্তর দিকে—আরো যাও—আরো যাও—উত্তর মেরুর সীমানায় চেয়ে দেখো বিরাট ভূভাগ! ওরই নাম গ্রীনল্যাণ্ড।

কে যে তামাসা ক'রে কবে ওর এই নাম রাখল কে জানে—কারণ সবুজ রং ওর সারা অঙ্গের কোথাও নেই! আছে কেবল শাদা রং—দুধের মতন শাদা—ভোরবেলাকার ফোটা যুঁইফুলের মতন ধবধবে—এবং এই শাদা রংটি আর কিছু নয়—শুধু বরফ, শুধু চির-তুষারের শুভ্রতা। হয়ত গ্রীনল্যাণ্ড নাম রাখার আর একটি কারণও থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে, ওই বিরাট মহাদেশটির কোথাও জন-বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন। ওখানে কোনোকালে মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা আর অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়নি—ওর বুকে কোথাও মানুষের দেওয়া ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছনা নেই, তাই হয়ত ওই মহাদেশটি চিরদিন তাজা—চিরসবুজ—তাই হয়ত ওর নাম রাখা হয়েছে গ্রীনল্যাণ্ড।

কিন্তু নামটি যত মিষ্টই হোক, দেশটি বড় ভয়ানক। যদিও এই দেশটিকে জগতের সর্ববৃহৎ দ্বীপ বলা হয়—আসলে এটি একটি বিরাট মহাদেশের মতো। যুগযুগান্তর অবধি এর আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। যারা এই দেশকে পরিদর্শন করতে গেছে, তারা আর

ফেরেনি; যারা বাস করতে গেছে এই তুষার-মুলুকে তারা কেউ বাঁচেনি। কত জাতির কত বীরের কঙ্কাল যে এখানে কঠিন বরফে ঢাকা রয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। কিন্তু বীরের অধ্যবসায় আর কষ্টসহিষ্ণুতা বরং মৃত্যুকে বরণ করেছে, কিন্তু প্রকৃতির তাড়নার কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। তাদের দুঃখ-জয়ের সাধনা অক্লান্তভাবেই চলেছে।

কিন্তু সত্যিই কি এখানে কেউ বাস করে না? বরফের সমুদ্রে শিলমাছ অথবা তিমিমাছ যেমন বাস করে, তেমনি এই মহাদ্বীপের পশ্চিম ভূভাগে বাস করতো এস্‌কিমোরা। তারা খর্বকায়, তুষারবাসী এক প্রকার জাতি। তারা ভেলায় চ'ড়ে শিলমাছ ধ'রে খায়, মেরুদেশের কুকুরের দল নিয়ে শ্বেত-ভালুক শিকার ক'রে বেড়ায়। কঠিন জীবনযাত্রা তাদের—কি বল? এ ছাড়া তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে—ডেনিস জাতির প্রতিনিধিরা যারা ওই মহাদ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেছিল—তারা ওই এস্‌কিমোদের মধ্যে মানব-সভ্যতা বিস্তারের জন্য ওর দুর্গম পশ্চিম ভূভাগে একটি শাসন-ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অসাধ্য-সাধন ইতিহাসের বিস্ময় বৈ কি!

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে গ্রীনল্যাণ্ডের প্রতি মানুষের দৃষ্টি প'ড়ে রয়েছে। প্রথমত, বৈজ্ঞানিকদের নজর আছে এই বিরাট বরফের চূড়ার দিকে, এর তুষার-নদী আর পাথরভরা পাহাড়ি উপকূলগুলোর দিকে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপ থেকে আমেরিকা অর্থাৎ কানাডা পেরিয়ে যেতে গেলে গ্রীনল্যাণ্ডকে বিশ্রামক্ষেত্র করা যায় কিনা, এই কথাটা বিচার ক'রে অনেকের মাথায় টনক নড়েছিল। বিশেষ ক'রে আধুনিককালে উড়ো-জাহাজের পক্ষে সুবিধা হওয়ার কথা সকলেই ভেবেছে। সুতরাং কেবল আজ নয়, শত শত বছর ধরে অভিযানকারীরা এই বিরাট ভূভাগের দিকে বার বার অগ্রসর হয়েছে।

এমনি একজন অভিযানকারীর কথা এখানে তোমাদের বলব। তিনি সেই জগৎ-বিখ্যাত বীর, উত্তর-মেরুচারী নরওয়েবাসী ডাঃ নান্‌সেন্। শস্যলতাহীন গ্রীনল্যাণ্ড মহাদ্বীপের ভিতর-ভূভাগে অভিযান করতে গিয়ে তাঁর আগে আর কেউ সাফল্যলাভ করেনি। মাত্র ৬৩ বৎসর আগে বিগত ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ নান্‌সেন্ এই প্রকাণ্ড বরফ-রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি অতিক্রম ক'রে এসেছিলেন। এই চির-দুঃসাহসী বীরের বয়স তখন সাতাশ বছর। দুর্গম-যাত্রার পথিক হিসাবে সুইডিস বীরশ্রেষ্ঠ সোয়েন হেডিনের পর ডাঃ নান্‌সেনের নাম ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

এই অভিযানের ঠিক আরম্ভে নান্‌সেন্ এবং তাঁর সঙ্গীরা কিভাবে বিপদে পড়েন সেই কথা শোনো।

যে জাহাজে তাঁরা বেরিয়েছিলেন, সেই জাহাজখানি এক বিরাট ভাসমান বরফের স্তূপের মধ্যে পুঁতে যায়। প্রথমেই এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হবার উপক্রম হয় এবং প্রাণ হারাবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়। অনেক কষ্টে, অনেক দুঃখে তাঁরা যদিবা তীরভূমিতে আসেন, কিন্তু প্রবল জলস্রোতের বেগে তাঁরা সুদূর দক্ষিণে ভেসে চ'লে যান। অবশেষে প্রাণপণ সংগ্রামের পর তাঁরা দুইটি বরফ-স্তূপের ফাটলের ভিতরকার জলপথে ভেলার সাহায্যে যতদূর সম্ভব ভিতর দিকে ভেসে চলতে চেষ্টা করেন। একটু এদিক-ওদিক—বরফ-স্তূপের একটু ভাঙন, প্রচণ্ড বাতাসের একটুখানি বক্রতার সৃষ্টি হ'লে—আর তাঁদের কিছুতেই বাঁচতে হ'ত না! সেদিকে লোক-বসতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও ছিল না।

মহাসমুদ্রের কাছাকাছি ব'লেই হয়ত এখানে একটুখানি গ্রীষ্মকাল দেখা যায়। মাত্র দু'চার দিন এ-অঞ্চলের কেথাও কোথাও দু'চারটি বনফুল এবং একটু-আধটু তৃণলতা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। সেই দিনগুলি

যদিও অতি অল্পায়ু, কিন্তু তবু ওই সকয়টুকুর মধ্যেই মেরুদেশের শৃগাল চ'রে যায়, রাজকীয় ভঙ্গীতে দু'একটি ঝব্বু মন্থর গতিতে বেরিয়ে পড়ে এবং মেরুদেশবাসী শাদা ভালুকরাও এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ওদিকে সূর্যের আভায় বরফের স্তূপে নানা রং খেলা করে, তুষারভরা গুহাগুলি নীল-সবুজ রংয়ে ভরে ওঠে।

কিন্তু কেবল ওইটুকু ভূভাগেরই এই সৌভাগ্য ঘটে। ওখান থেকে দেশের একটু ভিতর দিকে যেতে-না-যেতেই দেখা যায় কী প্রভেদ! বিশাল ঢালু উপত্যকা এসে নেমেছে এলো-মেলো তুষারময় হ্রদে—দুর্গম, বন্ধুর আঁকাবাঁকা ও ভীষণ গভীর সেই জলভাগ কোথাও কোথাও আবার ফাটলধরা। সেই হ্রদগুলির পারে যতদূর চোখ যায়—খালি পৃথিবী আর আকাশজোড়া বিশাল বরফের সমুদ্র—যেন মহাসাগর একটি শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে স্তব্ধভাবে শুয়ে রয়েছে। ডাঃ নান্‌সেন্ অপলক চক্ষে চেয়ে দেখলেন, সেই অনন্ত তুষার-সাগরে কোথাও তৃণলতা, জীবজন্তু কিছুমাত্র নেই!

এই বিপুল তুষারের বিস্তার বরং ভালো, কিন্তু মেরুপ্রদেশে গ্রীষ্মের আভাস-বিগলিত তুষার অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং সামনের এই দৃশ্য দেখে নান্‌সেন্ ও তাঁর সঙ্গীরা খুশী হলেন। সেই তুষার-উপত্যকায় অভিযান চালাতে তাঁদের এমন কিছু বড় রকমের বেগ পেতে হ'ল না বটে, কিন্তু সেই ভূভাগের তৃণলতা-জীবজন্তুহীন, চেহারাটা যেন তাঁদের বুকের ওপর পাথরের মতন চেপে বসল। সেই সুউচ্চ উপত্যকা সমুদ্রের থেকে প্রায় দু' মাইল উঁচু—চারিদিকে তার এমন কঠিন বরফ যে, সত্যি সত্যি তার তলায় কী আছে কিছুই বোঝা যায় না। অথচ সেই বরফ প্রতিদিনই বাড়ছে, কোনোদিন তুষারের বিরতি নেই।

অবশেষে একদা বহু দুঃখ ও বহু যন্ত্রণা সহ্য করার পর ডাঃ

নান্‌সেনের দল গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম তীরের কাছে এসে পৌঁছলেন। পিছল, ফাটল আর বরফের ধারগুলি অত্যন্ত সঙ্কটসঙ্কুল, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে পেরিয়ে আসতে হ'ল। সে যাই হোক, একদিন তারা সবাই সমুদ্রের খাঁড়িতে এসে পৌঁছে খুশী হলেন। কিন্তু এই ভূভাগের যেদিকে মানব-বসতির চিহ্ন ছিল, সেখান থেকে বহু ক্রোশ দক্ষিণে তাঁরা এসে নেমেছিলেন। লোকালয়ে যেতে গেলে যতদিন লাগবে, ততদিনের উপযুক্ত খাদ্য তাদের কাছে ছিল না। কেবল তাই নয়, যে সকল জিনিসপত্র না থাকলে এই সব অভিযান ব্যর্থ ও মৃত্যুপথমুখী হয়, তাদের সেই সকল বিভিন্ন সামগ্রীও ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুঃসাহসী ডাঃ নান্‌সেন্‌ তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার গুণে এই সাংঘাতিক সমস্যার প্রতিকার করতে লাগলেন। দু'খানা কুকুরের গাড়ী তিনি একসঙ্গে বাঁধলেন, ক্যানভাসের দ্বারা তাদের আবৃত করলেন। তারপর 'স্কী' খেলার ডাণ্ডাগুলোকে নৌকার দাঁড়ে পরিণত ক'রে সেই অদ্ভুত চেহারার নৌকা তিনি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরে ভাসিয়ে অসমসাহসিকতার সঙ্গে দাঁড় বেয়ে চললেন। সে ত' নৌকা-চালনা নয়, সেটা ঝড় ও সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করা, মৃত্যুর গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করা এবং উপবাস আর অপমৃত্যু থেকে নিজেদের কোনোমতে বাঁচানো। এইভাবে দীর্ঘ দিন-রাত একটির পর একটি অতিবাহিত ক'রে নান্‌সেন্‌ ও তাঁর সঙ্গীরা একদিন নিরাপদে এসে উত্তীর্ণ হন।

বহুকাল অবধি জগৎ-বিখ্যাত ভৌগোলিকরাও জানতেন না, গ্রীনল্যাণ্ড একটা দ্বীপ, অথবা আর কিছু। উত্তর দিকে মেরুলোকে কোথায় যে এর ভূভাগ বিস্তৃত হ'য়ে চলে গেছে, কেউ জানত না। এত বেশী বরফের সঞ্চার হ'ত চারিদিকে যে, সেই বিপুল তুষার-স্তূপ পেরিয়ে কোনোদিকে অগ্রসর হওয়া অথবা সীমানা আবিষ্কার

করা কেবল অসুবিধাজনক নয়, অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুলও ছিল। বিশেষ ক'রে পশ্চিম তীরের দিকে একটির পর একটি অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, —অসহনীয় যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সইতে না পেরে কত যে বীর মৃত্যুবরণ করেছে তারও কোনো সঠিক হিসাব নেই। কেবল বরফ নয়, তুষারের তলায় জীবন্ত সমাধি নয়, বরফে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ও আড়ষ্ট হয়ে মৃত্যু নয়—এ ছাড়া ভয়াবহ বন্য জানোয়ার, বিশেষ ভাবে মেরুবাসী হিংস্র ভালুকের পাল এবং এস্‌কিমোদের খামখেয়ালী প্রকৃতির তাড়না—এই সমস্ত মিলিয়ে গ্রীনল্যাণ্ড অভিযানের কাহিনী তোমাদের কাছে সকল সময়ই রোমাঞ্চকর মনে হবে! এই সব কাহিনী যাঁরা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন, তাঁরা সকল যুগের ভ্রমণ-বীরের কাছেই শ্রদ্ধেয়। তাঁদের দু-চার জনের নাম তোমাদের বলি—গ্রীলি, কেন্, পিয়্যারী, লক্‌উড্ প্রভৃতি।

গ্রীনল্যাণ্ডকে একটি দ্বীপ ব'লে যিনি প্রথম প্রমাণিত করেন, তাঁর নাম এডমিরাল পিয়্যারী। তিনি এই মহাদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্ত অবধি গিয়ে বহু এস্‌কিমোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। এই খর্বকায় এস্‌কিমোদের ওপর তিনি তাঁর বন্ধুত্বের প্রভাব এতখানি বিস্তার করেন যে, এরা তাঁর সঙ্গে উত্তর মেরু অবধি গিয়েছিল। যাই হোক, পিয়্যারী তাঁর সকল জিনিসপত্র, উপকরণ ও খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে ধীরে ধীরে কঠিন সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে দূর থেকে দূরে অগ্রসর হন। তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তে সর্বশেষ বিন্দু অবধি পৌঁছে-ছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে খেসারত দিতে হয়। তাঁর দু'খানা পা ঠাণ্ডায় এমনি জমে গিয়েছিল যে, তাঁকে দুই পায়ের আটটি আঙুল কাটিয়ে বাদ দিতে হয়। এই দুঃসাহসী বীর দু-দুবার সেই অঞ্চলে যান এবং তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের বেলাতেই তিনি তুষার-সমুদ্র পেরিয়ে উত্তর মেরুতে গিয়ে পেঁছান।

এরপর গ্রীনল্যাণ্ডের একটি মোটামুটি মানচিত্র প্রস্তুত করার জন্য একদল ডেনিস যুবক এই মহাদ্বীপের দিকে যাত্রা করে। তাদের দলপতির নাম ছিল মিলিয়াস্ এরিক্সেন্। এই দুঃসাহসিক অভিযানে তাদের পায়ের আঙুল হারানোর চেয়ে বেশী মূল্য দিতে হয়েছিল; কারণ, এই দলের দলপতিকে এই দুঃখ-সাধনায় প্রাণ হারাতে হয়। সেই কাহিনীও বলি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'ডেনমার্ক' নামক জাহাজে আটাশজন যুবক বেরিয়ে পড়ে। গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে তারা কোনো এক অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেয় এবং তাঁবু বাঁধে! পরের বছরে মার্চ মাসের শেষে —যখন বহু মাসব্যাপী মেরুরাত্রি তখনও শেষ হয়নি—সেই সময়ে কুকুরের গাড়ীতে চ'ড়ে তারা অগ্রসর হ'তে থাকে এবং 'পিয়ারীর উত্তরতম বিন্দুতে' (Peary's Furthest) এসে উপস্থিত হয়। তারা দুই দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল ক্যাপ্টেন কচের অধীনে উত্তর দিকে যায়; অন্য দলটি এরিক্সেনের অধীনে অর্ধচন্দ্রাকার সাগর-তটভূমি ধ'রে ভূভাগের অন্তরস্থলের দিকে প্রবেশ করে। অতি বেদনার কথা এই—প্রথম দলটি তাদের কাজ শেষ ক'রে একদিন ফিরে আসে, কিন্তু অন্য দলটি আর কোনদিন ফিরে আসেনি। যারা ফেরেনি তাদের কথাই শোনো।

এরিক্সেনের ছিল দু'জন সঙ্গী। একজন খর্বকায় এস্কিমো, তার নাম ব্রুনল্যাণ্ড; আর একটি ডেনিস যুবক—তার নাম হেগেন। তারা ডেনমার্ক ফিয়োর্ডের ধার দিয়ে যায়, পদে পদে ব্যর্থকাম হয়— কিন্তু অসীম সাহসের বলে অগ্রসর হ'তে থাকে এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আগে কিছুতেই তারা ফিরতে রাজি হয়নি। এইভাবে যেতে যেতে তারা আর একটি খাঁড়ির কাছাকাছি এসে তাদের লক্ষ্যপথ গুলিয়ে ফেলল। তখন তারা বিপদের গর্ভে এসে ঢুকেছে। এই ফিয়োর্ডগুলি

বরফ-স্তূপের ফাটলের মতো, জল অতি গভীর, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা—দু'ধারে হাজার হাজার ফুট উঁচু তুষার-পর্বত। এদের ভিতরে একবার পথ হারিয়ে প্রবেশ করলে যতদিন না এর প্রান্তভাগ পাওয়া যায়—ততদিন এদের হাত থেকে আর কোনো রকমেই মুক্তি নেই।

এইভাবে দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের আভাস এসে পড়ল। তোমাদের আগেই বলেছি তুষার-রাজ্যে গ্রীষ্মকাল বড়ই বিপৎসঙ্কুল। বরফ যখন গলে তখন তাব ফাঁদে পা বাড়াতেই হয় এবং পা বাড়ালেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এরিক্‌সেন্‌রাও অপ্রত্যাশিত ভাবে এই ফাঁদে প'ড়ে গেল। তারা তাড়াতাড়ি ডেনমার্ক ফিয়োর্ডে পালিয়ে এল। এল বটে, কিন্তু খাবে কি? অনেক কষ্টে তারা দু-চারটে জন্তু মারল, কিন্তু আর কিছুই পেল না। এরিক্‌সেনের চক্ষু আতঙ্কে অন্ধকার হয়ে এল! এই রকম উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় শরৎকালের আবির্ভাব হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ল্যাম্বার্ট দ্বীপের দিকে যাবার জন্য তুষার অতিক্রম ক'রে চলল; কিন্তু হায়, তারা যাত্রা করল সেদিন, যেদিন তাদের খুঁজে আনার জন্য এদিকের জাহাজ থেকে একটি রিলিফ পার্টি বেরিয়ে পড়েছে! এরিক্‌সেন্‌দের খাদ্য-সামগ্রী ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু এর চেয়ে বড় বিপদের কথা হ'ল—তাদের বুটজুতো ক্ষয়ে ছিঁড়েছে—জুতো বদলাবার আর কোনো উপায় নেই। জাহাজ থেকে তারা তখন শত শত মাইল দূরে! নিজেদের পা বাঁচাবার জন্য নানা উপায় তারা আবিষ্কার করল—যাতে কোনো প্রকারে তুষার অতিক্রম ক'রে যাওয়া যায়—কিন্তু অসম্ভব! সকল চেষ্টা তাদের মিথ্যে ব'লে মনে হ'তে লাগল।

অথচ আর কি উপায়? চেষ্টা ত' করতেই হবে! অক্টোবরের শেষ দিকে সূর্যদেব যখন এ-বছরের মতো অদৃশ্য হ'ল, তারা উপত্যকায় উঠে এল চারটি রুগ্ন কুকুর সমেত স্লেজ গাড়াটি নিয়ে।

এমন দিনে খাদ্য-সামগ্রী সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল। তাদের পাগুলি বরফের ঠাণ্ডায় জমে অবস হয়ে এল। তখন অনন্ত বরফের রাশির উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে তারা চলল—তাদের সামনে। তখনও একশত ষাট মাইল পথ বাকী। এই পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে তবে তারা জন-বসতির কাছাকাছি আসতে পারত। কিন্তু হায়, ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবকের দল! দীর্ঘ সাতাশ দিন ধ'রে তারা বুকে হাঁটল—অতি ধীরে—সাংঘাতিক ধীর গতিতে—কারণ তাদের আর শক্তি নেই—মৃত্যু এসেছে চোখের সামনে ঘনিয়ে—কিন্তু একদিন হেগেন সেই অনন্ত তুষার-শয্যার উপর শান্ত নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়ল! তার চোখে নামল নীল রংয়ের ঘুম—সেই ঘুম আর তার ভাঙল না!

বাকি রইল দু'জন! বন্ধুর মৃত্যু দেখে ভয়ে তারা কাঁপল—কিন্তু কঠিন তাদের পণ—তারা মৃত্যুকে ঠেলতে ঠেলতে চলল, বেপরোয়ার মতো বুকে হাঁটতে লাগল। এর দশদিন পরে—অর্থাৎ সাঁইত্রিশ দিন অক্লান্ত ভাবে হামাগুড়ি দেবার পর এই হতভাগ্য দলের দলপতি মিলিয়াস্ এরিক্‌সেন্ অনন্ত শয্যা গ্রহণ করল। এর পর বেঁচে রইল কেবল সেই এস্‌কিমো যুবক ব্রুন্‌ল্যাণ্ড—ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত, শক্তিহীন, আতুর ব্রুন্‌ল্যাণ্ড। সে উন্মাদের মতন গড়িয়ে গড়িয়ে চলল। একদিন সে গিয়ে পৌঁছল সেই লোকালয়ে মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে, বরফকে তুচ্ছ ক'রে। সেখানে গিয়ে সে হিংস্র জানোয়ারের মতন কতকগুলো খাবার গিলল—মনে হ'ল তার সকল ক্ষুধার শান্তি হয়েছে। তারপর সর্বাঙ্গে লোমের বস্ত্র দিয়ে মুড়ি দিল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই হ'ল তার মহানিদ্রা—সে ঘুম আর তার ভাঙল না!

কিন্তু এই বীরদলের মৃত্যু কি মিথ্যা হয়েছিল? তা হয়নি। সেই কথা তোমাদের ব'লে আমার এ-কাহিনী শেষ করব। তাদের সেই

অপরাজেয় আত্মার দুঃসাহস যে উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাকে অনুসরণ ক'রে আবার এক দল ডেনিস যুবক এল এগিয়ে। ক্যাপ্টেন কচ তাঁর জাহাজ নিয়ে দেশে ফেরবার আগে ব্রুন্‌ল্যাণ্ডকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু অপর দু'জনের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন র'য়ে গেল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে একটি সন্ধানী দল ইয়াইনার মিকেল্‌সেন্ নামক এক ডেনিস যুবকের অধীনে কপেনহেগেন থেকে গ্রীনল্যাণ্ড যাত্রা করল। উত্তর মেরুর দুঃখ-দুর্যোগ সম্পর্কে মিকেল্‌সেনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের চেষ্টা হ'ল, হারানো বীরদের চিহ্ন যদি কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। তারা সবশুদ্ধ দলে ছিল সাতজন। নূতন মানচিত্র অনুযায়ী পথ-ঘাট অনেকটা আয়ত্তে এসেছিল, সুতরাং প্রথমটা অসুবিধা হ'ল না। তারা সাতজন নানা দলে ভাগ হ'ল এবং শেষকালে যে দু'জন অগ্রগামী হিসাবে চলল, তারা হ'ল, মিকেল্‌সেন্ আর ইভার্‌সেন্। তারা সঙ্গে নিল পনেরোটি কুকুর আর একশত দিনের উপযোগী খাদ্য-সামগ্রী।

তারা ডেনমার্ক ফিয়োর্ডের ধারে এসে যখন পৌঁছল, দেখল মিলিয়াস্ এরিক্‌সেনের পরিত্যক্ত চিহ্ন। এখানে মেরুরোগে মিকেল্‌সেন্ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাকে কুকুর-টানা স্লেজ গাড়ীতে তোলা হয়। কিন্তু বরফে সর্বাঙ্গ অসাড় হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে টাট্‌কা মাংস খেতেই হবে—টিনের কৌটার খাবারে চলবে না। ইভার্‌সেন্ প্রতিদিন প্রায় ১২।১৪ ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে একটি-দু'টি দুর্লভ সামুদ্রিক মাছ শিকার করতে লাগল। এই খেয়ে মিকেল্‌সেন্ সেরে উঠল। তারপর তারা চলল দক্ষিণে— দশ দিনে মাত্র ছাব্বিশ মাইল পার হ'ল। একদিন তারা দেখল তাদের কাছে অতি সামান্য খাদ্য ছাড়া আর কিছুই খাবার

নেই। এই সময়ে ইভার্‌সেন্‌ অসুস্থ হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরগুলোও এমন আধমরা হয়ে এল যে, সবগুলোকে শ্লেজের উপর তুলতে হ'ল। কিন্তু ঘটনাক্রমে কুকরগুলির উপর প্রভুদের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি পড়ল এবং একে একে কুকুরগুলিকে হত্যা ক'রে তারা ভোজন করতে বাধ্য হ'ল। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আর কোথাও কিছু খাদ্য নেই। তখন দু'জনে উপবাসের ভয়ে উন্মত্তের মতো অগ্রসর হয়ে চলল—মালপত্র, তাবু, শ্লেজগাড়ী, ঘুমোবার থলি—সব রইল পিছনে। অবস্থা চরমে উঠল যখন নয় মাস ঘুরতে ঘুরতে ফিরে এসে তারা দেখল, তাদের জাহাজটি বরফের আঘাতে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ। নিরুপায় হয়ে তারা জাহাজের কাঠ খুলে তাবু বানাল। তাদের দলের অন্যান্য লোক ইতিমধ্যে তাদের আশা ছেড়ে একজন শিল-শিকারীর সাহায্যে দেশে ফিরে গেছে। সুতরাং তাদের দু'জনকে সঙ্গিহীন অবস্থায় এই বিভীষিকার রাজ্যে থেকে শীতকালটা কাটাতেই হবে।

ভাঙা জাহাজটিতে খাদ্য-সম্ভার ছিল প্রচুর। এক বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত, তাদের উপবাসের আতঙ্ক থেকে তারা রেহাই পেয়েছে। শীতের অন্ধকার মাসগুলি নিতান্ত একঘেয়ে রকমে কাটাবার পর যখন ভ্রমণ করা সম্ভব মনে হ'ল, তখন তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিত্যক্ত মালপত্রগুলি উদ্ধার ক'রে আনল।

পরের বৎসরের অন্ধকারে শীতের মাসগুলিও তারা তাঁবুতে যাপন করতে বাধ্য হ'ল। মাঝে মাঝে বেরিয়ে তারা ঝব্বু শিকার ক'রে আনে টাট্‌কা মাংস পাবার জন্য। তারপর আবার সেই যন্ত্রণাদায়ক তৃণলতা-জীবজন্তু-শূন্য নির্জন সমুদ্র-তীর। একবার তারা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করল। বাসরক্‌ নামক এক অন্তরীপের ধারে এসে জানল, তারা যখন মাত্র পনেরো মাইল দূরে তাদের তাঁবুতে বাস করছিল—সেই সময় একখানা জাহাজ এখানে নোঙর করে।

এখন আর সে জাহাজ নেই—সুতরাং আবার তাদের এ-বছরের সেই একঘেয়ে শীতকালটাও এই যন্ত্রণা-জর্জর উত্তর মেরুর শীত সহ্য ক'রে থাকতে হবে। তাদের জীবন এবার অসহনীয়—কেবল জানোয়ারের মতন একঘেয়ে আহার ও নিদ্রা!

তৃতীয় বছরের বসন্তকাল দেখা দিল। তারা বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হ'ল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ অবধি তারা সেই বীভৎস তুষার-গর্ভে থাকতে বাধ্য হয়েছিল—অবশেষে একটি রিলিফ্ পার্টি তাদের খুঁজে পায় এবং সগৌরবে দেশে ফিরিয়ে আনে। হিসাব করলে দেখা যায়, মিকেল্‌সেন্ ও ইভার্‌সেন্ সুদীর্ঘ আড়াই বছরকাল গ্রীনল্যাণ্ডের দুর্গমতম ও ভয়াবহ বরফের দেশে অতিবাহিত ক'রে আসে। এই উদাহরণ সম্ভবত আর কারো জীবনে নেই।

গ্রীনল্যাণ্ড চির-দুর্গম, চির-অন্ধকার, প্রাণ-চিহ্নহীন—কিন্তু তবু যেসব বীর আপন প্রাণ উৎসর্গ ক'রে দুঃসাধ্য তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছে, তাদের জীবন মৃত্যুহীন, তারা ইতিহাসের সর্বকালে অমরত্ব লাভ করেছে—এ তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে। বীরদের কোনদিন মৃত্যু নেই!

সাগর তরঙ্গ

ভারতবর্ষের পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্র—এ তোমরা জানো। সমুদ্রের দৃশ্য চমৎকার। আজ বঙ্গোপসাগর ও আরব সমুদ্রের কিছু পরিচয় দেবো। ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অবস্থিতি অনেকটা আরব, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মালয় প্রভৃতির ন্যায়—অর্থাৎ এরা সবাই উপদ্বীপ, তিনদিকে জল এবং একদিকে স্থল। পৃথিবীর দক্ষিণে এমন কোনো উপদ্বীপ বোধহয় নেই, যার উত্তর দিকে জল এবং দক্ষিণ ভাগে স্থল। অনাবিষ্কৃত দক্ষিণ মেরুপথের কথা আমি জানিনে।

ভারত মহাসাগরের বিস্তার ও পরিধি অনেকটা আলোচনা-সাপেক্ষ। প্রধানত পৃথিবীর সভ্যতার আদান-প্রদান প্রশান্ত ও আতলান্তিক মহাসাগরের উপর দিয়েই হয়ে থাকে—ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার ভিতরে এই দুই সমুদ্র। আমাদের ভারত মহাসাগর অনেকটা অনাদৃত। এই মহাসাগরের দুই পুত্র, দুইটিই দস্যু। একটি অতিশয় চঞ্চল—তিনি বঙ্গোপসাগর, অপরটি আরব সমুদ্র, কিছু প্রকৃতিস্থ। ভৌগোলিক কারণে বঙ্গোপসাগর বৎসরের প্রায় সকল সময়েই বিক্ষুব্ধ, অশান্ত। আরব সাগরের প্রাণের মধ্যে বিপ্লবের অংশ কম।

বাঙ্গলার দক্ষিণভাগ থেকে সিংহল দ্বীপ অবধি প্রধানত বঙ্গোপ-সাগরের দৈর্ঘ্য, ওদিকে আরাকান, পেগু ও রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুর অবধি। লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরের অন্তর্গত, এই কথা বলা হয়ে থাকে। কলিকাতা থেকে চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন,

সিঙ্গাপুর, যাভা ও বলী দ্বীপে যাঁরা যান তাঁদের বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়েই যেতে হয়, দ্বিতীয় আর পথ নেই। জলপথে ভারতের নিজস্ব ব্যবসায় অতি সামান্য, সেই কারণে কেবলমাত্র যাত্রী জাহাজ এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বিশেষ যাতায়াত করে না। পুরী, নাগপত্তম্, ভিজাগাপত্তম, গোপালপুর, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি নগরগুলি বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত, কিন্তু এদিকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য না থাকার জন্য আজও এইগুলির একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া হয় না। আমি কেবল যাত্রী-জাহাজের কথা বলছি। পুরী থেকে মাদ্রাজ সমুদ্রপথে কেউ যায় না—ব্যবসা-বাণিজ্য রেলপথেই চলে, কিন্তু কলকাতা থেকে রেঙ্গুন জাহাজ ভিন্ন গতি নেই, দু'টিই ব্যবসাকেন্দ্র। একথা ঠিক, মানুষ বিপদ ও দুর্যোগকে এড়িয়ে চলে—স্থলপথে কাজ হাসিলের সুবিধা থাকলে জলে কেউ পা বাড়ায় না। আমাদের ভারতবর্ষ একটি ছোট-খাটো মহাদেশ। অন্নবস্ত্রের জন্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে গিয়ে কোনো-দিন আমাদের দ্বারস্থ হতে হয়নি। ঘরে বসেই আমরা দু'হাতে ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিই, বিদেশীরা জাহাজে ক'রে এসে আমাদের উচ্ছিষ্ট মাথায় তুলে নিয়ে যায়—এই সব কারণে সমুদ্রপথ আমাদের জাতির কাছে অনেকটা অপরিচিত। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঠিক এমন অবস্থা ছিল না। তখন রাজসিকতা ছিল ভারতবাসীর রক্তে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা একদা বাণিজ্য করে এসেছি, বহু ঐতিহাসিক তা প্রমাণ করেছেন। আজ বাহিরের বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের পথেই আমাদের যোগাযোগ পুনরায় ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা না হ'লে সমুদ্রপথে আনাগোনা যে কোনো সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কলকাতা থেকে নদীপথে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে গেলে সাগরের একটা আভাস পাওয়া যায়। যাঁরা গঙ্গাসাগর অথবা রেঙ্গুন যাত্রা

করেছেন তাঁরা জানেন। নদীর জল ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে, নদীর বিস্তার বাড়তে থাকে, ঢেউগুলি একটু একটু বড় হ'তে থাকে, নৌকা অথবা ষ্টীমার দুলতে থাকে। সাগরের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলে আপনা থেকে শরীরের ভেতর এমন একটা ক্রিয়া হ'তে থাকে যে, সেটা কোনো চওড়া নদীতেই কখনো হয় না। দেখতে দেখতে জলের রং বদলে যায়—দূর থেকে কেমন একটা আশ্চর্য নীলবর্ণের সমাবেশ হ'তে থাকে। নদীতে আমরা যে সকল প্রকাণ্ড জাহাজ দেখে বিস্ময় অনুভব করি, সমুদ্রে তাদের দেখলে করুণা হয়। জাহাজগুলি মোচার খোলার মতো দেশলাইয়ের খোলের মতো ইতস্ততঃ ভাসতে থাকে। সমুদ্রের উপরে আজো মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেনি, তার কারণ ঝড় ও ঝঞ্ঝায় সমুদ্রের যে রুদ্র মেজাজ তার কাছে মানুষ আজও অবনত। যত বড় জাহাজ ও যত কিছু আত্মরক্ষার উপকরণ বলো সমস্তই সমুদ্রের খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করে—নিজের খুশিতে সে রাখে, নিজের খুশিতে মারে।

গঙ্গাসাগর থেকে একশো মাইল দক্ষিণে গেলে বাহির সমুদ্রে জাহাজ এসে পড়ে। বঙ্গোপসাগর অতিশয় চঞ্চল, আতলান্তিকের মতোই এর হিংস্রতা। প্রাকৃতিক কারণে এই সমুদ্রের ভিতরে বৎসরের প্রায় সকল সময়েই একটা প্রবল বিক্ষোভ আত্মঘাতী আন্দোলনে অস্থির হ'তে থাকে—বর্ষার মেঘের দিনে দেখা যায় বরুণ দেবতার রুদ্র তাণ্ডব। জাহাজের উপর থেকে চেয়ে দেখো, দিগন্তে যতদূর দৃষ্টি চলে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উন্মত্ত তরঙ্গ আকাশকে আক্রমণ করছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সেই উন্মাদনার আদিও নেই, অন্তও নেই।

সমুদ্র মাত্রেরই প্রকৃতি অনেকটা এক। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আকাশে উদয়াস্ত যেমন রঙের খেলা চলে, তেমনি সেই আকাশের পরিবর্তনশীল রঙও সমুদ্রে প্রতিফলিত হয়। প্রভাতকালে বঙ্গোপসাগরের

রং অনেকটা ফিকে সবুজ, শ্যাওলাপড়া দীঘির মত—সেই রং বদল হয় মধ্যাহ্নে, রৌদ্রকিরণে নীল আকাশ যখন ঝলমল করে, সমুদ্রও সেই সঙ্গে হয় ঘন নীল—এমন আশ্চর্য নীল যে, মনে হয় কলম ডোবালে কালির মতো উঠে আসবে—আবার অপরাহ্নের দিকে চেহারা বদলায়, সিংহের কেশরের ন্যায় ধূসর বর্ণ। যারা পুরীতে গিয়ে দেখেছেন অথবা আমার মতো রেঙ্গুনে গেছেন, তাঁরা আমার কথা স্বীকার করবেন। তবে বঙ্গোপসাগরের প্রলয়ঙ্কর মূর্তি যারা দেখতে চান, তাঁরা বর্ষায় জাহাজে উঠবেন। সম্মুখবর্তী ব্যাঘ্রের গর্জন এবং ঝড়ের সমুদ্র—এই দুই দৃশ্য সহ্য করার জন্য স্নায়ুতন্ত্রের প্রবল শক্তি থাকা দরকার। এমন অনেক দেখা গেছে, ঝড়ের সমুদ্রের বিভীষিকা দেখে মানুষ চেতনা হারিয়েছে—সমস্ত বিশ্বব্যাপী এমন একটা দানবীয় বিভীষিকা দেখা যায়, যে দৃশ্য মৃত্যুর অপেক্ষাও ভয়াবহ, কেমন একটা পৈশাচিক তাড়নায় মানুষ জ্ঞান হারায়। জাহাজ কেবলমাত্র দোলে না, কাৎ হয়ে সাগরের জলের ভিতরে নেমে যায়, আবার যুদ্ধের ঘোড়ার মতো লাফিয়ে ওঠে, আবার আর এক পাশে ডুব দেয়। যখন কাৎ হয়, তখন সমুদ্রের তরঙ্গ জাহাজের ডেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যা কিছু থাকে প্রবল বেগে ধুয়ে নিয়ে আবার নিচে চলে যায়। সমুদ্রে ঝড়ের সময় যাত্রীরা নিচে হোল্‌ডের মধ্যে বন্ধ থাকে, নচেৎ উপরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা।

সাগর পাখীরা সমুদ্রের উপর বিচরণ করে। তারা জলের উপর বসে, জলের মাছ ধরে খায়। সমুদ্রের উড়ন্ত মাছের দৃশ্য চমৎকার। তারা জলের ভিতর থেকে পাখীর মতো উড়ে গিয়ে আবার একজায়গায় জলে অদৃশ্য হয়। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে অজানা অনামা জলের জানোয়ার। সমুদ্রের নিচে বিশাল সাম্রাজ্য—মানুষ আবিষ্কার করেছে তার যৎসামান্য অংশ, এখনো অনেক বাকি। আমরা সমুদ্র-রহস্য

সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তার চেয়ে অনেক বেশি জানিনে।

বঙ্গোপসাগরে যেমন দেখা যায় নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য, আরব সাগরে তেমনি দেখা যায় নিমীলিত-নেত্র ধ্যানী মহাদেবকে। তাঁর জটায় জটায় তরঙ্গমালা কিন্তু তার মধ্যে আছে একটি প্রসন্ন সমন্বয়। অন্তরে অন্তরে অনন্ত আক্ষেপ কিন্তু বাহিরে অস্থির নয়। করাচী থেকে যাও দ্বারকায়, সেখান থেকে সৌরাষ্ট্রের সীমানা ঘেঁসে যাও বোম্বাই—কিন্তু চেয়ে দেখো সমস্ত সাগর সূর্যের কিরণে নীলকান্তমণির মতো ঝলমল করছে। দিক থেকে দিগন্তের দিকে কল্পনা উড়ে চলুক, ভয় কোথাও নেই। শরৎকাল থেকে গ্রীষ্মের শেষ অবধি বাতাস অতি মধুর। সমুদ্রের শীত যেমন কম, গ্রীষ্মও তেমনি সহনীয়। নব বর্ষার দিনে আরব সমুদ্রের উপর দিয়ে মেঘ এলো, তরঙ্গে তরঙ্গে যেন ময়ূর পেখম মেলে নেচে উঠলো। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গদলে যেমন একটা সর্বনাশের ষড়যন্ত্র চলে, আরব সাগরে সেই দৃশ্য দেখা যায় না, সেখানে ঢেউগুলি গলাগলি করে—সেখানে বিপদ নেই, আছে একটি অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য! জাহাজে চ'ড়ে চ'লে যাও সীমাহীন সাগরের রহস্যালোকে, মনে হয়, কোথাও যেন বিপদ নেই। সাগরের হাওয়ায় যে ওজন আছে, জাহাজের যাত্রীরা সেই বস্তু সেবন করে অতিশয় পরিতৃপ্ত হয়। শীতের দিনে আরব সমুদ্র ভ্রমণ অতি আনন্দদায়ক!

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। আমি বারম্বার বলেছি সমগ্র ভারত-ভ্রমণ পৃথিবী ভ্রমণের আনন্দ দেয়—একই সময়ে সকল ঋতুর এমন একত্র সমাবেশ, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চিরতুষারময় পর্বত একদিকে, চিরবসন্তময় প্রদেশ একদিকে। শীতের দিনে কোথাও অশ্রান্ত বারিধারাময় বর্ষাকাল, আবার অন্য কোথাও হয়ত গ্রীষ্মকালে তুষারপাত হচ্ছে। স্থলভাগ আমাদের এত

বৃহৎ, এত ঐশ্বর্যময় যে, জলপথে আমরা ভ্রমণ করিনে। আমরা আরামপ্রিয় শান্ত জাতি, তার কারণ আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য স্থলভাগ থেকেই পাই। আমাদের অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দেবার জন্য তাঁর অন্নসত্র নিত্য খুলে রেখেছেন।

তবু এমন কথাব লবো, সমুদ্র ভ্রমণের জন্য পৌরুষের প্রয়োজন। দৃঢ়চিত্ত, বীর্য বিক্রম, অতুল সাহস, অসীম অধ্যবসায়—সমুদ্র-পথে এইগুলি একান্ত প্রয়োজন। কল্পনাকে বিশালতব করে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের দিগন্তহীন পরিব্যাপ্তি। পৃথিবীব্যাপী আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-ক্ষুধা, অজানা দেশ ও জীবনকে আবিষ্কার কবার যে ব্যাকুলতা, বিজ্ঞানকে করতলগত করার যে প্রবল তৃষ্ণা—সমুদ্র পথে ভাসলে আমরা এই সকল কামনাকে একান্ত ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। ভারতের উপকূল পরিত্যাগের সময় আমরা যেন বুঝতে পারি, ঘর থেকে পথে বেরিয়েছি আপন স্বাস্থ্য এবং স্বাধীনতাকে অনুভব করার জন্য। আমাদের সকল বাঁধন খুলে গেছে।

ভারতীয় সভ্যতার একটি মহৎ নিদর্শন জলাশয়ের তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষের সকল নদীর তীরে যেমন দেবালয়ের শঙ্খ, ঘণ্টা বাজে, ভারতীয় সমুদ্রের উপকূলেও তেমনি দেখতে পাই বিশাল মন্দির-শ্রেণী। বঙ্গোপসাগরে-যেমন পুরী, ওয়ালটেয়ার, গোপালপুর, মাদ্রাজ, রামেশ্বরম, তেমনি আরব সমুদ্রে করাচী, দ্বারকা, বীরবল, বোম্বাই—সকল স্থানে মন্দির কোথাও না কোথাও আছেই। জবাকুসুমসঙ্কাশম বালক সূর্য দেবতার প্রথম রশ্মি পূর্ব ভারতে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরের শিরশ্চুম্বন করে; আবার যখন অপরাহ্ণের দিকে দিনান্তের রক্তিম সূর্য অস্তাচলে নামেন, তখন তাঁর শেষরশ্মি স্পর্শ করে আরব সাগরের উপকূলে দ্বারকানাথের বিশাল মন্দির চূড়া। দুই সাগরের তীরে এই দুই দেবমূর্তি ভারতের কল্যাণকামনায় চিরজাগ্রত।

পূজায় পশ্চিম ভ্রমণ

একটা গল্প তোমরা মনে মনে কল্পনা করো। এই ধরো, একদল ছেলেমেয়ে পূজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। পূজোর সময়ে সাধারণতঃ বাঙালীরা পূর্ব দিকের চেয়ে পশ্চিম দিক বেশী পছন্দ করেন। ছেলেমেয়েরা পশ্চিম ভারতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আজকাল কন্‌সেসন্ টিকিট হয়ে ভারী সুবিধা, তার উপর ট্রেনের বিধি নিষেধ আগের চেয়ে একটু আলগা হওয়ায়, সকলের পক্ষে সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ান চলে। এই ধরো, একদল ছেলেমেয়ে হাওড়া থেকে পাণিপথ পর্যন্ত টিকিট কাটলো। মাঝখানে যত সহর যত দেশ যত রাজ্য—যেখানে খুশি নেমে তারা সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করতে পারে।

পূজোর ছুটিতে ছেলেমেয়েরা পশ্চিমে যেতে ভালবাসে। তার কারণ বর্ষাকালের পরে শুষ্ক দেশের দিকে তাদের আকর্ষণ হয়। পূজোর পর থেকে শীতকাল পযন্ত বাঙলা দেশের স্বাস্থ্য তেমন ভাল থাকে না, অথচ এই সময়ে পশ্চিম দেশে স্বাস্থ্যকর বাতাস, অবারিত মাঠ, উজ্জ্বল রৌদ্র—এদের ভিতরে এসে বাঙালীরা একরকম নবজীবন লাভ করে। ধরো তোমরা পূজার ছুটিতে দিল্লী পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলে, তাবপর তোমাদের ছুটি শেষ হয়েছে, তোমরা কোল্‌কাতার দিকে ফিরে আস্‌ছো। পশ্চিমে তোমরা প্রথম গিয়েছ, সুতরাং কোথায় কি দেখবার জিনিষ আছে তা হয়ত তোমাদের জানা নেই। প্রথমতঃ দিল্লীতে যা দেখবার আছে দেখে নাও। আগে পুরোনো দিল্লী দেখ। বিশাল জুম্মা মস্‌জিদ, তার ওদিকে বিরাট দিল্লীর দুর্গ।

তারপরে দেখ সেই জায়গাটা যেখানে দাঁড়িয়ে নাদির শা এক লক্ষ নরমুণ্ড নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। তারপরে দেখ দিল্লীর সু-উচ্চ নগর প্রাচীর। প্রাচীর পার হয়ে নূতন দিল্লীর দিকে যাও, দেখবে আধুনিক সহর, বড়লাটের প্রকাণ্ড রাজত্ব। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে যাত্রা কর, সহর পার হয়ে যাও, দেখতে পাবে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষ, ঐতিহাসিককালের অগণিত রাজা ও রাজত্বের ধ্বংসস্তূপ! পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ সম্রাট হুমায়ুনের বিশাল সমাধি মন্দির। তারপর আরো কিছু দক্ষিণে যাও, কুতবমিনার দেখতে পাবে। মিনারের মাথায় উঠে দেখ, দূরে ক্ষীণকায়া যমুনা আর চারিদিকে শত শত মাইল ব্যাপী পুরাতন ও প্রাচীন ইতিহাসের অতীত অবশেষ। সমস্ত দিল্লীর হাওয়ায় মহাকালের নিঃশ্বাসের শব্দ কান পেতে শুনে নিও। দিল্লী থেকে নেমে এস। টুণ্ডলায় এসে নাম, সেখান থেকে যাও আগ্রায়। আগ্রায় গিয়ে দেখ দিল্লীর মত প্রকাণ্ড সহর। যমুনা নদী সহরের ভিতরে এসে আবার সেই পথ দিয়ে ঘুরে চলে গেছে, যেন কুণ্ডলীকৃত কাল ফণিনা তার দংশনে সমস্ত সাম্রাজ্য, সকল মান ঐশ্বর্য বিষাক্ত নষ্ট করে দিয়েছে। সেই শীর্ণকায়া যমুনার তীরে এসে দাঁড়াও, চেয়ে দেখ নদীর পশ্চিম পারে রক্তবরণ গগনস্পর্শী দুর্গ এবং পূর্বদিকে চেয়ে দেখ দূরে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প, মোগল সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বেগম মমতাজের সমাধি মন্দির "তাজমহল"। সূর্যের আলোয় তাজের এক রকম রূপ, জ্যোৎস্নায় অন্যরূপ, অমাবস্যার রাত্রে আর একরকম চেহারা। তাজ থেকে ফিরে এসে উত্তর দিকে যাও, যমুনার পুল পার হয়ে চল, কিছুদূর গিয়ে পাবে এতমত্‌উদ্দৌল্লা। মনে হবে, এও যেন একটি ছোটখাট তাজমহল। এই নিভৃত উদ্যানে মমতাজ বেগমের পিতা-মাতার সমাধি মন্দির। আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রি মাত্র বাইশ মাইল। এখানে সম্রাট আকবর এক সময়ে তাঁর

রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু জলের অভাবে অতবড় ঐশ্বর্য তাঁকে ত্যাগ করে আসতে হয়। আগ্রার নিকটেই সম্রাট আকবরের সমাধি মন্দির।

এইবার মোটামুটি তোমাদের আগ্রার ভ্রমণ শেষ হল। এরপর তোমরা তিন চার দিনের জন্য আগ্রা থেকে রাজপুতানার খানিকটা ঘুরে আসতে পার। অন্ততঃ জয়পুর পর্যন্ত। পথে পথে দেখতে পাবে সোণার বরণ মাঠের উপর দিয়ে সোণার হরিণের পাল দৌড়ে চলেছে। ময়ুর পাখা মেলছে মাঠে মাঠে। জয়পুরে দেখে এস পাহাড়ের মাথায় অম্বর প্রাসাদ, দেখে এস গোবিন্দজীর মন্দির, আরো অনেক কিছু দেখে আসতে পারবে।

আবার আগ্রার দিকে ফিরে এস। গাড়ি বদল করে মথুরায় এসে নাম। দ্বারকানাথের মন্দির দর্শন কর, বিশ্রামঘাটে সন্ধ্যারতি দেখ, তারপর সেখান থেকে বৃন্দাবনের দিকে চল। পথ অল্পই, টাঙা গাড়িতে যাওয়া যায়। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির বিখ্যাত কিন্তু সহরটি ছোট। গিরি গোবর্ধন, কালীয়দমন, ধীর সমীর, ললিতাকুঞ্জ, নিধুবন প্রভৃতি অনেক জায়গা দেখা যাবে।

এর মধ্যে বলে রাখি, পশ্চিম থেকে কলকাতা আসবার আর একটা পথ রয়ে গেছে, সে পথটা দেরাদুন, হরিদ্বার হ'য়ে দক্ষিণ পূর্বের দিকে নেমে চলেছে। পথে সাজাহানপুর, মোরদাবাদ, বেরিলী। বেরিলী থেকে উত্তরে কাঠগুদাম হয়ে নৈনিতাল, আলমোড়ার দিকে যাওয়া যায়। আবার এই বেরিলী থেকে গাড়ী বদল করে আলিগড়ে আসা যায়। আলিগড়ে পৌছে আমরা আবার আমাদের সেই পুরোনো মেন লাইন ধরতে পারি। ইতিমধ্যে মথুরা থেকে হাতরাশ এসে, ওখানকার একটা বড় দুর্গ দেখে আমরা দেশের দিকে ফিরচি। ওদিকে আলিগড় এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় দেখা হয়ে গেল।

আসবার পথে কানপুরে নামা যায়। প্রকাণ্ড সহর, সূতা ও পশমের বড় বড় কল ও কারখানা এবং সহরের অন্যদিকে বহু অফিসার ও ধনীলোকের বাস। কানপুর সহর খুব সুন্দর ও আধুনিক। কানপুর থেকে গঙ্গা ডিঙিয়ে দেরাদুন লাইনে যাওয়া যায়। এই ছোট রেলপথের এক সীমায় কানপুর, অন্য সীমায় লক্ষ্ণৌ। বাঙলা দেশে মাঠ আছে, নদীতীর আছে, বন আছে, কিন্তু বাগান বলতে যা বোঝায় তা বাঙলা দেশে বড় কম। অথচ পশ্চিমের যে কোন সহরে দিল্লী বলো, মীরাট বলো, কানপুর বলো, লক্ষ্ণৌ বলো—সকল সহরে যেখানে যেটুকু জায়গা পাওয়া গেছে, সব জায়গায় ফল ও ফুলের বাগান। কানপুর থেকে মেন লাইন ছেড়ে আমরা লক্ষ্ণৌ এসে আবার হাওড়া দেরাদুন লাইন ধরলাম। লক্ষ্ণৌ পশ্চিম দেশে খুব একটা ভাল বেড়াবার জায়গা। সহরের কূলেই গোমতী নদী। আগ্রা ও এলাহাবাদের মতন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বড়, তা'ছাড়া মোগল রাজাদের বহু প্রাচীন কীর্তি, প্রাচান নবাবগণের অসংখ্য বিলাসকুঞ্জ। বেগমদের হারেম, হামাম, শীষমহল। প্রাচীন গোলাপ-বাগ ইত্যাদি আরো বহু রকম দ্রষ্টব্য স্থান বর্তমান। আগ্রা ও দিল্লীর পরে লক্ষ্ণৌতে আজও ভ্রমণ করিলে মুসলমান রাজেশ্বর্যের অসংখ্য কীর্তি চোখে পড়ে। লক্ষ্ণৌ ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সঙ্গীতকেন্দ্র। এখানে বহু প্রদেশ থেকে এমন কি বাঙ্গালারাও গিয়ে সঙ্গীত সাধনার জন্য নিয়মিত বসবাস করেন।

এইবার লক্ষ্ণৌ থেকে নেমে আসা যাক। অযোধ্যায় নেমে আমরা দেখতে পাই, ধূলাবালি মাখা পুরোন সহর। দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে কেবল শ্রীরাম চন্দ্রের মন্দির। পাণ্ডারা যাত্রীদের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার বহু বিচিত্র কাহিনী শোনায়, সম্ভব অসম্ভব বহু স্থান দেখায়—যার উল্লেখ রামায়ণেও নেই। অযোধ্যা থেকে ছেলেরা

জৌনপুর হয়ে কাশী রওনা হোক। এদিকে আমরা ততক্ষণে কানপুর থেকে এলাহাবাদে এসেছি। কাশীতে গিয়ে দুই দলে দেখা হবে।

এলাহাবাদ সহরের বুকের ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সহরে নামলে আধুনিককালের নাগরিক সাজসজ্জা ছাড়াও পশ্চিম দেশের একটা রুক্ষ উদাস ও ধূসররূপ দেখা যায়। কিন্তু এলাহাবাদের পথগুলি দীর্ঘ ও ঋজু, অনেক সময়ে শুধু জয়পুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এলাহাবাদ সহর সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ছাউনি সহর দ্বিতীয়টি পুরান সহর। বর্তমান এলাহাবাদ সহর উত্তর প্রদেশের সর্বপ্রধান বিচারকেন্দ্র। ছাউনি সহরে আজকালকার দিনের যা কিছু উপকরণ সমস্তই দেখা যায়। যারা কলিকাতায় থাকে, তাদের কাছে আর কোন সহরের বর্ণনা করার দরকার নেই। পুরোন এলাহাবাদ সহর অনেকটা আগ্রা ও কাশীর পথঘাটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পুরোন সহরের ভিতর দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে গেলে তিন মাইল দূরে যমুনা নদী পাওয়া যায়। নদী তীরেই এলাহাবাদের বিশাল প্রাচীন দুর্গ। তার অনেক অংশ ভগ্ন। নদীর উত্তর-পূর্ব কোণে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। পুণ্য তিথিতে বহু যাত্রী এই সঙ্গমে নৌকাযোগে স্নান করিতে আসে। বালুর চড়া ও নদীর চর বহু মাইল প্রশস্ত। এলাহাবাদের অপর নাম প্রয়াগ।

এইবার আমরা এলাহাবাদ ত্যাগ করে বিন্ধ্যাচলে এসে পৌঁছলুম। বিন্ধ্যাচল পাহাড় সুদূর আরাবল্লী পাহাড়ের একটি শাখা। এই পাহাড়ের বাতাস ও জল অতি স্বাস্থ্যকর। ক্ষুদ্র সহর অতি নিরিবিলি। বেড়িয়ে বেড়াবার মাঠ অজস্র। আশেপাশে ছোট ছোট বনময় গ্রাম। পাহাড়ের মাঝখানে অষ্টভূজা বিন্ধ্যবাসিনীর

মন্দির। এই পাহাড়ের শেষাংশ থেকে বহুদূরে গঙ্গার আভাস পাওয়া যায়।

বিন্ধ্যাচলের পরে কাশী এসে ছেলেরা আবার একত্র মিলিত হোল। কাশী হিন্দুর সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। অনেকেই বলেন, কাশীধাম ভারতবর্ষের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কাশী সহর আজও উপযুক্ত আধুনিক সহর হয়ে উঠতে পারেনি; এর কারণ এখানে ধর্ম চর্চার এত বেশী প্রাধান্য যে, আর কোন বিষয়ে স্থানীয় লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। কাশীতে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, শ্রীদুর্গা প্রভৃতি বড় মন্দিরগুলি ছাড়াও বহু মন্দির সহরের অলি-গলিতে প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন কোন পল্লীতে প্রত্যেক বাড়ীতে একটি শিব মন্দির আছে। এখানকার গঙ্গা উত্তরবাহিনী এবং গঙ্গার প্রবাহটা অর্ধচন্দ্রাকার। নদীর ওপারে ব্যাসকাশী। কাশীর নদীতীর ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য। এমন ভাবময়, রূপময় ও মোহময় সৌন্দর্য আর কোন নদীতীরে দেখা যায় না। মণিকর্ণিকার ঘাট, মানমন্দির, দশাশ্বমেধ, অহল্যাবাঈ, দ্বারভাঙ্গা, যোগিনী কেদার, হরিশ্চন্দ্র, চেৎসিংহ প্রভৃতি সকল ঘাটে কোথাও বা সাধু-সন্ন্যাসীর আস্তানা, কোথাও চলছে পূজা পাঠ, কোথাও নামকীর্তন, কোথাও বেদজ্ঞান, কোথাও বা স্নানার্থীদের জটলা—মনে হয় যেন কাশীর ঘাটে ঘাটে নিত্য উৎসবের সমারোহ। যারা কাশী ভ্রমণে যায়, তারা গঙ্গার ওপরে নৌকায় চড়ে সকল ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ায়। নৌকা ভ্রমণ কাশীতে খুব আনন্দদায়ক। পশ্চিমের আর সব সহরের মতন কাশীতে বানরের উৎপাত এখনও খুব বেশী। অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ ও মূলগন্ধকুটি বিহার প্রধান।

এইবার কাশী থেকে বেরিয়ে ছেলের দল মোগলসরাইতে দুই

ভাগে ভাগ হলো। একদল গেল পাটনার দিকে অন্যদল গয়ার পথে। প্রথম দল পাটনা সহরে বেড়িয়ে নিল। নূতন পাটনা সহরের বাগানবাড়ীগুলি অতি সুদৃশ্য, গাছপালা ছাওয়া চওড়া রাস্তাগুলিতে বেড়িয়ে বেড়ান খুব আরামদায়ক। অনেক জায়গায় গাছের ছায়ার নীচে ছেলেমেয়েরা চড়ুইভাতি করে। পাটনার পরে একেবারে সাঁওতাল পরগণায় ছেলেরা এলো। শিমুলতলায় এসে বনে জঙ্গলে বেড়ালো, দেওঘরে গিয়ে নন্দন পাহাড় আর ত্রিকূটে গিয়ে চড়লো, বালাজীর মন্দিরে বেড়িয়ে এলো। মধুপুরে গিয়ে মাঠে মাঠে বেড়ালো, তারপর গেল গিরিডি। গিরিডির সাঁওতাল পাড়ায় ঘুরলে বেশ আনন্দ হয়। গিরিডি থেকে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া যায়। এইসব দেখে ছেলেরা পূজার আনন্দ কাটিয়ে কোলকাতার দিকে যাত্রা করলো।

ওদিকে দ্বিতীয় দল মোগলসরাই থেকে গয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিল। তারা সহরে বেড়ালো, ফল্গু নদী দেখলো, বুদ্ধগয়া দর্শন করলো, তার পরে চলে এলো হাজারীবাগ। হাজারীবাগ ষ্টেশন থেকে মোটরে বনের ভেতর চল্লিশ মাইল পথ গিয়ে হাজারীবাগ সহর পাওয়া গেল। ছোট সহরটি খুব নিরিবিলি ও স্বাস্থ্যকর। এখান থেকে আরও ষাট মাইল গেলে রাঁচি সহর পাওয়া যায়। এই পথের চারিদিকে গভীর অরণ্য—সেই অরণ্য নানাবিধ হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ। হাজারীবাগ থেকে পরেশনাথ পাহাড়। এই পাহাড় চার হাজার ফুট উঁচু, ছ'মাইল চড়াই উঠতে হয়। পাহাড়ের মাথায় পরেশনাথজীর মন্দির। পরেশনাথের চারিদিকে মোটরে বেড়াবার পথ অতি সুন্দর। যারা অল্প মূলধনে উৎকৃষ্ট ভ্রমণ সম্পন্ন করতে চায়, তারা যদি এই সকল স্থানে পূজোর ছুটিতে আসে, তবে সকল দিক দিয়েই তাদের ভ্রমণ সফল হয়। গয়া লাইনে পাহাড়, নদী, অরণ্য, উপত্যকা প্রভৃতি

অনেক বেশী এবং জল হাওয়া খুব ভাল। যাই হোক, দ্বিতীয় দল ও প্রথম দল আসানসোল এসে আবার একত্র মিলিত হলো। আসানসোল থেকে আসবার সময়ে ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় নেমে কয়লার খনিগুলো বেড়িয়ে আসা যায়। এর পরে গাড়ীতে উঠে ছেলেরা হাওড়ার দিকে যাত্রা করে পূজার কনসেসন টিকিটের ভ্রমণ শেষ করল।

সাঁওতালের কথা

আজ তোমাদের কাছে সাঁওতালদের কিছু কথা বলব। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অসভ্য জাতির কথা তোমরা পড়েছ, এই সাঁওতালরা তাদেরই বংশশ্রেণী। এরা বাংলা দেশের আশেপাশেই বিশেষ করে ছড়িয়ে রয়েছে, অবশ্য ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই এদের যাতায়াত। কলকারখানা, চা বাগান, কৃষিকাজ--প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে অনেক সময়ে এদের নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রায়ই সেই কাজে গিয়ে এরা দেশের নানা স্থানে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। যারা সাঁওতালদের দেশে গেছে, তারা জানে সাঁওতাল পরগণা ছাড়াও— সিংভূম, মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি জেলাতেও এরা বসবাস করে। এদের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি সভ্য ভারতবাসীর থেকে ভিন্ন, সেই কারণে এরা কাছে থেকেও দূরে দূরে ঘরকন্না বাঁধে। এরা অনেক সময়ে থাকে দুর্গমে--যেদিকে পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, জলাভূমির আনাচ কানাচ। বন্য প্রকৃতির সঙ্গে এরা নিজ স্বভাবের একটা আপোষ রক্ষা ক'রে চলে। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের গায়ে-গায়ে এদের বড় বড় উপনিবেশ।

হাওড়া লাইনে ভ্রমণে বেরিয়ে অণ্ডাল পার হলেই যেন মনে হ'তে থাকে বাংলা দেশে আর নেই। ডোবা, জলা, জঙ্গল, কচুরিপানা একে একে যেন মিলিয়ে যায়। তার বদলে ক্রমে ক্রমে দেখতে পাওয়া যায় উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো মাঠ, মাঠের রং লালচে। বড় বড় ডাঙ্গা, কাঁকর পাথরের পথ, শাল আর মহুয়ার বন—এই চিহ্নগুলো যেন

সাঁওতালদের ডেকে আনে। রানীগঞ্জ, বরাকর, সীতারামপুর অঞ্চলে দেখো কাতারে কাতারে সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ কলকারখানা আর কয়লার খনিতে কাজ নিয়ে আশেপাশে উপনিবেশ বসিয়েছে। আসানসোলের পরে জামতাড়া, মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা, গিরিডি, উশ্রী—এরা সমস্তই সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত। এখানকার স্বাস্থ্যকর বাতাস ও সুস্বাদু জলে সাঁওতালদের স্বাস্থ্য অতি বলিষ্ঠ ও কর্মঠ। এই দু'টি বস্তুই সাঁওতাল পরগণার সকলের বড় ঐশ্বর্য। জলে লোহার ভাগ বেশি, সেই জন্য ছোট ছোট নদীর প্রবাহের ধারে ধারে লোহার কস দেখতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের এত নিকট অথচ সাঁওতাল পরগণার মাটি জল আর বাতাস বাঙ্গলার থেকে এত বিভিন্ন।

অসমতল মাঠ সাঁওতাল পরগণার এক বিশেষত্ব। এই মাঠের সীমায় সীমায় শালের ঘন জঙ্গল—প্রায়ই এই সকল জঙ্গলে বড় বড় হিংস্র জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার মৃত্তিকায় পাথরের অংশ বেশি, সেই জন্য বর্ষার জল কোথাও কাদা জন্মায় না, হয় মাটির নীচে যায় নয়ত প্রবাহিত হয়ে দূরে নিম্নভাগে চলতে থাকে। নিজস্ব ভূমি ও অধিকার অল্প হওয়ার জন্য এবং শস্য ও ফসলের অপ্রাচুর্য বশত সাঁওতালি স্ত্রী-পুরুষ জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এত কর্মঠ। কোনো বৃহৎ বাণিজ্য, পণ্য বিপণির আদান-প্রদান, গৃহশিল্পজাত কোনো কিছুর কাজকারবার এসব বড় একটা সাঁওতালদের মধ্যে দেখা যায় না। শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা মাঠে জঙ্গলে যে সকল কাজ তাদের পক্ষে সম্ভব, তার প্রতিই তাদের আগ্রহ প্রবল। মানুষের বসতি যেদিকে নেই এমন সব দুর্গম জায়গায়—অরণ্যে, ছোট ছোট পাহাড়ে, পতিত ও পরিত্যক্ত কোনো ভূভাগে সাঁওতালিরা চাষ করতে যায়। ভীষণ অরণ্য—এমন কি যেখানে বাঘ ভালুকের অবারিত গতিবিধি, যেদিকে

সভ্যমানুষের কোনো পদচিহ্ন দেখা যায় না—এমনি সব জায়গায় সাঁওতালি মেয়েপুরুষ স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে আনাগোনা করে। বর্শা, তীরধনুক, বল্লম, টাঙ্গি—এই সকল তাদের অস্ত্র। দল বেঁধে জানোয়ারকে বন্দী ক'রে হত্যা করা, এদের কাছে একটা খেলা মাত্র।

কয়লার খনিতে যারা কুলি মজুরের কাজ করে—অর্থাৎ যে সকল কয়লার খনি মোটামুটি সাঁওতাল পরগণার সীমানায় পাওয়া যায়—সেখানে বেশির ভাগ সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ কাজ করে। মেয়েরা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে খনির ভিতরে নেমে যায়। বিপদকে চোখের সামনে না দেখলে বিপদের সম্ভাবনাকে তারা গ্রাহ্যই করে না। এই স্বভাব নিয়েই তারা আজন্ম মানুষ। একজন সাঁওতালি মেয়ে অনায়াসে দুইজন বলিষ্ঠ পুরুষের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। সারাদিন তারা পরিশ্রম করে, তারপর সন্ধ্যার সময় তারা পাঁচ-দশ মাইল রাস্তা গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়। কাঁকালে ও পিঠে দুইটি শিশুকে নিয়ে এক একটি মেয়ে মাইলের পর মাইল গল্প করতে করতে হাঁটে। গ্রীষ্মকালে হয়ত সারাদিন মাঠে জঙ্গলে, পাহাড়ের ধারে, রৌদ্রে অথবা কলকারখানায় কাজ ক'রে তারা ফিরল, কিম্বা বর্ষায় ভিজে ভিজে তারা ঘরে এলো—দেখলো ঘরের চালায় পাতা ঢাকা নেই। শীতের দিনে শীত-বস্ত্রের অভাব, শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা ভাত আর নুন—কিন্তু তবু ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ নেই, তারা সহজেই সেই জীবন যাপন করে।

অসভ্য জাতির আদিম ভাব সাঁওতালদের মধ্যে খুব স্পষ্ট। সামান্য প্রলোভন দেখালে তারা ঘর ছেড়ে চলে আসে। সরলতা তাদের চরিত্রের প্রধান গুণ। কিন্তু সেই সরলতার সঙ্গে পাওয়া যায় অরণ্যের হিংস্রতা। প্রতিহিংসার উন্মাদনায় প্রাণ দেওয়া ও প্রাণ নেওয়া তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। শত্রুকে অনেক সময় তারা

মাটির নীচে পুঁতে ফেলে। সাঁওতালরা সভ্য মানুষের সমাজে, যন্ত্র ও উপকরণ সম্পন্ন লোকালয়ে সহজে আসতে চায় না—বন্য প্রকৃতির সঙ্গে একটা আপোষ রক্ষা ক'রে জীবনযাপন করে।

সাঁওতালদের সমাজে যে লোকটি নিয়মনীতি রক্ষা ক'রে চলে তার নাম মাতব্বর। অনেক সময়ে তারই হাতে সমাজ শাসনের ভার থাকে। সে সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তার বিচার মাথা পেতে নিতে হবে। পালা পার্বণে, আনন্দ উৎসবে তার কিছু প্রণামী পাওয়া চাই। সিংভূম, বীরভূম, মানভূম, ডুম্‌কা প্রভৃতি স্থানে বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, কেবলমাত্র পূর্বপ্রচলিত আচার ও প্রবাদের উপরেই সাঁওতাল সমাজের বিধিব্যবস্থা চলে এসেছে। তারা নতুন ক'রে কিছু ভাবে না, নতুন করে কিছু গড়ে না। মাতব্বরের নির্দেশ মেনে চলাই তাদের কাছে সকলেব বড় ধর্ম।

সাঁওতাল মেয়ে পুরুষে বিয়ে হবে। সে যেন একটা ভয়ানক যুদ্ধ। ঢাল, তলোয়ার, টাঙ্গি, বর্শা—হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল! সভ্য মানুষের কাছে এটা নতুন লাগে। বরপক্ষ এলো, ভয়ানক একটা বিক্রম প্রকাশ করল, তার সঙ্গে কন্যাপক্ষের একটা যুদ্ধ ঘোষণা করা গেল। শেষকালে বীর বিক্রমে পুরুষ গিয়ে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো। কন্যাপক্ষের পরাজয়ের হাহাকার, বরপক্ষের বিজয়োল্লাস। যারা জয়ী হলো তারা নেশা ক'রে সারারাত মাতামাতি করতে লাগলো। আর যারা পরাজিত তারা সান্ত্বনা হিসেবে কিছু সাহায্য পেলো।

তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পড়েছ অনার্য জাতির কথা, সাঁওতালরা তাদেরই উত্তর পুরুষ। ব্রাহ্মণের পরে ক্ষত্রিয়রা যখন ভারতে সভ্যতা বিস্তার করে, এই অনার্য জাতির সঙ্গে তাদের প্রায়ই বিরোধ বেধে যেতো। কিন্তু ভারতের জল মাটির এমনই গুণ যে

জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলন সহজেই ঘটে। ধর্ম ও সভ্যতার পথে আর্য অনার্যের মিলন হয়েছিল। ওরা সাপ, গাছ, পাথর এই সকলের পূজা করে, আমরা সাপের বদলে মনসা, গাছের বদলে অক্ষয়বট ও পাথরের বদলে দেবলিঙ্গ পূজা করলুম। আমাদের শিব শান্ত ও কল্যাণময়, ওরা শিবকে দেখালো গঞ্জিকাসেবী ব্যাঘ্র-চর্মাবৃত, ভবঘুরে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা আমাদের, ওরা তার সঙ্গে আনলো শ্মশানচারিণী করালী কালী নরমুণ্ডমালায় শোভিত। জগদ্ধাত্রীকে আমরা দিলুম পূজা, ওরা চাইলো রক্তপাগলিনী ছিন্নমস্তাকে। আমরা দেবতার আরাধনা করলুম, ওরা করল রাক্ষসের স্তব। ভগবান রামচন্দ্র একদিকে, ত্রিভুবন বিজয়ী রাজা রাবণ অন্য দিকে। আর্য ও অনার্যের বিরোধ নিয়েই তো রামায়ণ মহাকাব্য লিখিত। যাই হোক, ঐতিহাসিক যুগে এসে আর্য ও অনার্যের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। এখন অনার্যের অধিকার আর্য অপেক্ষা কম নয়। সাঁওতালদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা নিজেদের সর্পবংশ, বানর বংশ, রাক্ষস বংশ ব'লে কৌলিন্যের পরিচয় দেয়।

শীতকালে প্রধানত সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে নানা রকমের উৎসব পালন করে। সেই উৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ বাদ্য ও সঙ্গীত করতে করতে গ্রামের বাইরে এসে হাট বসায়। যে কোনো উৎসবে নৃত্য এদের খুব প্রিয়—নৃত্যের মধ্যে 'ছো' নৃত্য অনেকেই দেখে থাকবে। এই সব নাচের সঙ্গে এমন একটা একঘেয়ে সুরে ডুগডুগি বাজতে থাকে যে, দূর থেকে শুনলে খুব ভালো লাগে। গানের মধ্যে একটা কেবল ধুয়ো—সেইটে বারম্বার পুনরাবৃত্তির ফলে শ্রোতার কাণে কেমন একটা মোহ সৃষ্টি করে। সেই সুর যেন অরণ্যের রহস্য ও গাম্ভীর্যকে প্রকট করে।

অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল আগুনের আভা আর শোনা গেল ডুগডুগির চাপা শব্দ। জানা গেল, সাঁওতালদের কিছু একটা কাণ্ডকারখানা আছে। এগিয়ে গিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যাবে, একটা যুদ্ধের আয়োজন চলছে। দেবতার সঙ্গে অসুরের সংগ্রাম। এদিকে হয়ত বাণাসুর আর ওদিকে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—এমনি একটা পৌরাণিক রূপক। দেখা যাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। দেখতে দেখতে দামামা ও শিঙা বাজলো। সকলের পরণে রক্তবস্ত্র, মাথায় ময়ূরের পালক, গলায় হাড়ের মালা—আর রাক্ষসদের পরণে ব্যাঘ্রচর্ম। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ভয়ে বিবর্ণ, তিনি পরাজিত। তাঁকে পদানত করা রাক্ষসদের কর্তব্য। নিকটে রক্তাক্ত সিংহ ও ব্যাঘ্র—যোদ্ধারা বর্শা ও বল্লমে আক্রান্ত, আর সেই অন্ধকারে আগুনের আভায় ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সকলের শরীর থেকেই দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে।

আবার বাজলো ডুগডুগি, তার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল নরনারীর তাণ্ডব নৃত্য। শালবনের অন্ধকারে সমস্ত রাত ধরে এমনি একটা অদ্ভুত, বর্বর ও অসভ্য আনন্দে আরণ্যকের দল মাতামাতি করতে থাকে প্রায়ই।

বাংলার নদী ও গ্রাম

বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধে আজকে কিছু বলব। বাঙ্গলার স্বাস্থ্য, কৃষি অথবা বাণিজ্য নয়, আমার বিষয় হচ্ছে এই প্রদেশের একটা ভৌগলিক পরিচয় দেওয়া—অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশ ভ্রমণ করলে ভ্রমণকারীর দৃষ্টি কোন্ কোন্ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়।

ইংরেজ সভ্যতার গোড়ার দিকে গ্রামই ছিল শিক্ষাকেন্দ্র, আমাদের সভ্যতা গ্রামের মধ্যেই ছিল প্রসারিত। কিন্তু জীবনযাত্রার নূতনত্বের লোভে কল, কারখানা, যন্ত্রবিজ্ঞান, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুশীলনের আকর্ষণে—অর্থাৎ প্রচলিত জীবনধারাকে বাইরের দিকে, পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে আত্মীয়তায় প্রসারিত করার জন্য শহর গ'ড়ে উঠলো। আজ সেই জন্য সুদূর পল্লীবাসিগণ পর্যন্ত শহরের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে।

পৃথিবীর ভূগোল আলোচনা করলে দেখা যায়, জলের ধারেই মানুষের বাসা—জলই সবশ্রেষ্ঠ খাদ্য। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলাতেই নদীর সংখ্যা বেশি, সেইজন্য এখানকার মানুষ মৌমাছির মতো চাক বেঁধে বেঁধে জলের ধারে ব'সে গেছে। নদীগুলি মায়ের মতো বাঙ্গালীকে লালন করে, প্রাণদায়িনী স্তন্যদানে তাদের জীবনে প্রাণ সঞ্চার করে। বাঙ্গলার নদী তাই মাতৃরূপিনী, বাঙ্গলা তাই নদী-মাতৃক। সোনার বাঙ্গলা নাম কেন হোলো? এখানে সোনা ফলে, এর লেশতম স্থান অনুর্বর নয়, এর পথে পথে ঐশ্বর্য, পদে পদে লক্ষ্মীর ধান্যের স্বর্ণমঞ্জরী।

ভ্রমণকারীর পক্ষে বাঙ্গলা দেশ ভূস্বর্গ। দক্ষিণে নীল পদ্মের মতো সমুদ্র, উত্তরে মহাযোগী হিমালয়, সেই যোগীর পদপ্রান্তে অরণ্যের এলোকেশ বিস্তার ক'রে কুমারী মেয়ের মতো বাঙ্গলাদেশ অপস্যায় বসেছেন। নদীর সঙ্গে গ্রাম, গ্রামের সঙ্গে প্রান্তর, প্রান্তরের পারে বনরেখা—এই সকলের এমন সুন্দর সুষমা ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। আমি নিজে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি, আমি দেখেছি বাঙ্গলার আকাশে যেমন সারা দিনমান ধ'রে রঙের খেলা চলে, এমন আর কোন প্রদেশে হয় না। এর কারণটা প্রাকৃতিক। অসংখ্য নদীর জলে প্রতিফলিত সূর্যের সপ্তরশ্মি, শীত এবং গ্রীষ্মের রূঢ়তার অভাব, অরণ্যের সতেজ নীলাভ ছায়া। যাঁরা বহু দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করেছেন, তাঁদের কাছে বাঙ্গলা যেন একটি মধুর ও আনন্দদায়ক বিশ্রামাগার, একটি বিলাস-তপোবন। বাঙ্গলা দেশের লোকসংখ্যার কারণ এইটি—এখানকার মৃত্তিকার সঙ্গে যার একটিবার পরিচয় সে আর নড়ে না। বাঙ্গলার অন্নপূর্ণার দানের হাত সকলের জন্য মুক্ত——এ যেন সাধারণ লোকের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস।

ধরো, বাঙ্গলা দেশে হঠাৎ একদিন রেলওয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমাদের উপায় ? ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশে রেলওয়ে বন্ধ হলে তারা বিপন্ন হবে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশ অবারিতই থাকবে, তার ব্যবসা বাণিজ্য. লোক চলাচল, আদান প্রদান, বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। এর কারণ কি ? এর কারণ সোনার বাঙ্গলা যে নদীমাতৃক। যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো স্থানে যাতায়াত নদীপথে সহজ ও অবারিত। তুমি কলকাতা থেকে যেতে চাও আসামে। এখান থেকে ষ্টীমারে চড়ো। ভাগীরথীর উপর দিয়ে দক্ষিণে চলো, খিদিরপুর, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, আরো চলো, দুই ধারে ভাগীরথীর শাখা প্রশাখায় বাঙ্গলার দক্ষিণ ভাগে বহু গ্রামে

ভ্রমণে যাও, পথ কোথাও বন্ধ নেই। ডায়মণ্ডহারবার ছেড়ে যাও সমুদ্রের দিকে, ভাগীরথীর শাখা-প্রশাখা, যাও সুন্দরবনের কিনারা দিয়ে—যাও যশোরের দক্ষিণে, সেখান থেকে খুলনায়—এক নদীর ভিতর দিয়ে অন্য নদী—ভৈরবের উপর দিয়ে যাও—নবগঙ্গা, কালীগঙ্গা, চিত্রা—আবার পাবে পদ্মা, যাও তুমি বরিশালে, সেখান থেকে যাও মালদহে, এদিকে যাও ঢাকা—দেখবে নদীর সঙ্গে নদীর সংযোগ, মেঘনা পাবে, বুড়িগঙ্গা পাবে, মধুমতী পাবে: দক্ষিণ-পূবে যাও অসংখ্য নামহারা নদী। নদী, খাল, সমুদ্রের মোহানা—নৌকা তোমার ভেসেই যাবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, এক শহর থেকে অন্য শহরে। উত্তরে মালদহ ছেড়ে নদীপথে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ—কোথাও তোমার জলপথের অভাব ঘটবে না, নৌকা তোমার চলবেই। ব্রহ্মপুত্র নদে এলে, আসামের যে কোনো দিকে যাও। তেজপুর, শ্রীহট্ট, মণিপুর, ডিব্রুগড়। তুমি যাত্রা শেষ করলে।

তোমরা জানো বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাস প্রধানত ভাগীরথী গঙ্গাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভাগীরথীর দুই তীর—একদিকে হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, অন্যদিকে চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ—এরা বহু যুগ ধরে সাহিত্য, শিক্ষা, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করেছিল। বাঙ্গালী তার আপন ভাষা গড়েছে নদীর জলে, গঙ্গামৃত্তিকায় গড়েছে প্রতিমা, কাব্য সৃষ্টি করেছে নদীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে, দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছে নদীর তীরে তীরে। সহস্র ধারায় নদী বয়ে চলেছে, তাই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কল্পনাশীল কবির জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিজীবন উচ্ছ্বসিত হয়েছিল নদীর চরে।

ভাগ্যের বিড়ম্বনায়, কর্মবিমুখতায় বাঙ্গালী আজ দারিদ্র্যে ও রোগে

অবনমিত, মারী মন্বন্তর ও ম্যালেরিয়ায় তারা বিধ্বস্ত, কিন্তু প্রকৃতি আপন ঐশ্বর্যের দিক থেকে বাঙ্গালীর প্রতি কৃপণতা করেনি। নাগরিক জীবনযাত্রার যে একটা প্রবল প্রলোভন, সেই বস্তু আমাদের গ্রাম থেকে টেনে এনেছে। আমাদের দারিদ্র্যটা অন্নবস্ত্রের অভাব নয়, প্রধানত আর্থিক দারিদ্র্য। যে কোনো গ্রামে যে কোনো সময় গিয়ে দেখো, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত রয়েছে, শস্যলক্ষ্মীর অবারিত প্রাচুর্য—কিন্তু ভাগ বাঁটোয়ারার বৈষম্য নিয়েই যত কিছু বিরোধ, ঘরের অন্ন পরের হাতে তুলে দিয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকা—এই অভ্যাস আমাদের নাগরিক জীবন যাপনের ফল, এ অভ্যাস আগে ছিল না।

ঋতু পরিবর্তন বাঙ্গলায় যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, এমন আর ভারতবর্ষে কোথাও নয়। বর্ষায় সমস্ত বঙ্গদেশের যেন বিরহিনী মূর্তি—সর্বআভরণহীন, করুণ কেতকীর গন্ধে যেন তার বিচ্ছেদের নিশ্বাস—পল্লীপ্রান্তর নদীনালা সরোবর ও দীর্ঘিকা যেন চোখের জলে টলোমলো। শরৎকালে গ্রাম ভ্রমণ করলে দেখা যায়, শেফালী মল্লিকা আর কাশফুলের কী হাসি, আগমনীর সুর নির্মল আকাশে, শস্য পরিপূর্ণ ক্ষেত্র—সবেমাত্র হেমন্তের নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে, প্রভাতে লাগছে শিশিরকণা পত্রপল্লবে। ধান পাকলো, এলো শীত, বাতাস ঠাণ্ডা, শীতল নদীর জল, প্রবাহ স্তিমিত—ধান বোঝাই মহাজনী নৌকা চললো—গ্রামে গ্রামে নবান্নের উৎসব। আবার দেখতে দেখতে এলো রৌদ্রের উত্তাপ, দক্ষিণায়ণ থেকে সূর্য এলেন উত্তরায়ণে, দক্ষিণ সমীরণ এলো বসন্তের বার্তা জানিয়ে, এলেন ঋতুরাজ—উদ্ধত যৌবন এলো ফুল ফোটাতে, পুরাতন বৎসরকে ধ্বংস ক'রে নূতন বর্ষের উদ্বোধন করতে। তিনি এলেন ভাঙনের আর সংহারের পথ ধ'রে—তাঁর যাবার পর দেখা গেল নবরূপ, লতাবৃক্ষ, তৃণগুল্ম সতেজ, নূতন পাতায়

সজীব ফুল ঝরে গিয়ে ফল ধরালো গাছপালায়। চারিদিকে যখন জল গেল শুকিয়ে তখন প্রাণের অমৃত রস ভরে উঠলো ফলে ফলে। ধূলায় ধূসর বৈশাখের বাতাস জ্বলে উঠলো, নূতন শস্যের বীজ বপন ক'রে সমগ্র বাঙ্গলা রৌদ্রদগ্ধ শূন্যের দিকে চেয়ে বললে, 'দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী, হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।' হে রুদ্র, তোমার এই শ্মশান চিতায় মেঘের জল ছিটিয়ে দাও। তখন আমরা পুনরায় বৃষ্টিধারার জন্য বিধাতার দরবারে দরখাস্ত পেশ করলুম।

ছয়টি ঋতুর এই যে আবর্তন, ছয়টি ডালা হাতে ছয়টি ঋতুর এই যে নৃত্য—ভ্রমণকারীকে এই কথা মনে রাখতে হবে। যারা কিছু দুঃসাহসী তারা ভ্রমণ করবে বর্ষাকালে। তখন নদী, নালা, পল্লী প্রান্তর জলে পরিপূর্ণ—তখন নদীর ভাঙন, তখন গঙ্গা, ইছামতী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত, গর্জন বুনিয়া আর আঁধারমাণিক ভয়সঙ্কুল—সেই সময়ে নদীর কূল আর চেনা যায় না—প্লাবন-প্রলয়ের আবর্তে আবর্তে দুঃসাহসী তার তরণী ভাসিয়ে নিরুদ্দেশে যাত্রা করুক। শরতে যাও দেখবে, আগমনী আর শারদীয়া পূজায় বাঙ্গলার প্রাণের ভিতর এসেছে আনন্দের জোয়ার। বাঙ্গলার ঐশ্বর্য যারা দেখতে চাও, তারা ভ্রমণ করবে শীতকালে। নবান্নের উৎসবে লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে ঘরে। বসন্তকালে যারা ভ্রমণ করবে, তারা দেখবে সোনার বাঙ্গলার অঙ্গ-আভরণ পলাশ আর শিমুল, শাল, মহুয়া আর কৃষ্ণচূড়ায় লেগেছে রক্ত-উৎসব। সমস্ত বঙ্গদেশ যেন তখন একখানি পুষ্পপাত্র। গ্রীষ্মকালে যাও গ্রামে গ্রামে জল-শূন্য জলাশয়, শূন্য প্রান্তর—বসন্ত শেষের তৃষ্ণা প্রাচীন অশ্বত্থের ছায়ায় হু হু ক'রে বইছে, রুদ্র ভৈরবের পদপ্রান্তে ব'সে উপবাসিনী বঙ্গজননী যেন বিধাতার মতো জপের মালা ঘুরিয়ে চলেছেন—আর প্রান্তরের পারে বটের ছায়ায় রাখাল একা বসে করুণ

তার বাঁশের বাঁশি। শীর্ণ নদী ব'য়ে চলে অতি স্তিমিত ধারায়।

বাঙ্গলার এই রূপের আকর্ষণে আমি ভ্রমণ করেছি। শ্রাবণ রাত্রের অমাবস্যায় আমি দেখেছি মা জননীর মূর্তি করালী কালিকা, চৈত্রের মধুপূর্ণিমায় দেখেছি ফুলশয্যায় বিবশা সুহাসিনী, পৌষের উৎসবে দেখলাম সীমন্তিনী অন্নপূর্ণা, আর বৈশাখে দেখেছি শুষ্ক নদীর চরে গৈরিকবস্ত্রা জননী চক্ষু বুজে বসেছেন জপে।

সমগ্র বঙ্গদেশের এই পরিচয়টুকু দিয়ে আমি আজকের মতো তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

আসামের কথা

আজ তোমাদের কাছে আসাম প্রদেশের পরিচয় দেবো। পূর্বে আসাম ও বাঙ্গলা দেশ ছিল সহোদর ভাই, এখন রাষ্ট্রনৈতিক কারণে দু'জনের মাঝখানে ঘটেছে বিচ্ছেদ।

বাল্যকাল থেকে জেনে এসেছি আসাম দেশে বৎসরে দুইবার বর্ষা নামে, সেখানে হিংস্র শ্বাপদের অবাধ স্বাধীনতা, সেখানকার গগনস্পর্শী পর্বতমালা ও গহন অরণ্যানী ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। দুরারোগ্য কালাজ্বর, ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র, হিংস্র ঐরাবত, গর্জায়মান পার্বত্য নদী—আসামের প্রধান আকর্ষণ।

পূজোর ছুটিতে যাত্রা করেছি। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার বা আলিপুর থেকে আমিনগাঁও পর্যন্ত গেলে ব্রহ্মপুত্র নদ পাওয়া যায়। বাঙ্গলার একদিকে কুলনাশিনী পদ্মা, অপর দিকে দিগ্বিজয়া ব্রহ্মপুত্র—এই দুই নদী ও নদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হিসেব ক'রে বলা কঠিন। ব্রহ্মপুত্র সমগ্র আসামকে প্লাবিত ক'রে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে নেমে গেছে। সকালবেলা আমরা নদের ধারে এসে নামলাম। এখানে কোনো সেতু নেই, তার কারণ প্লাবনের প্রবাহটা এদিকে নিত্যনৈমিত্তিক। উত্তর দিকে খসিয়া ও জয়ন্তী পর্বত থেকে যখন ঢল নামে, ব্রহ্মপুত্র তখন হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর, তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বিস্তৃত নদ, তীরে লোকালয় ক্বচিৎ চোখে পড়ে, জলরেখার কানায় কানায় কোথাও ছোট ছোট পাহাড় যেন পূজারী ব্রাহ্মণের মতো আহ্নিক করতে ব'সে গেছে। সেতু না থাকার জন্য প্রকাণ্ড ষ্টীমার

খেয়া পারাপারের জন্য সকল সময়েই মোতায়েন রয়েছে। এপারে আমিনগাঁও ষ্টেশন, ওপারে পাণ্ডুঘাট। সকালবেলা ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হওয়া বড়ই আরামদায়ক। এই সময়টা শীতের আমেজ পাওয়া যায়—আসাম দেশে বৎসরের সকল সময়েই কোথাও না কোথাও শীত জমা থাকেই। শীতপ্রধান দেশ ব'লেই আসামবাসীদের গায়ের রং অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং চক্ষুতারকা একটু আধটু কটা। অরণ্যবাসী ও চাষীদের কথা আমি বলছিনে।

নূতন এক দেশে এসে অবতীর্ণ হলাম। পাণ্ডুঘাট আসামের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান। প্রথম কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র গৌহাটি অত নিকটে, দ্বিতীয় কারণ রাজধানী যাবার পথ এখান থেকেই আরম্ভ, তৃতীয় কারণ পাণ্ডুঘাট থেকে তিন মাইল দূরে ভারতবর্ষের বিখ্যাত তীর্থ—উমানন্দভৈরব, কামরূপ পর্বতে কামাখ্যা-দেবী ও ভুবনেশ্বরী। পাণ্ডুঘাটের কাছেই আবার রেল ষ্টেশন। সকালের কোমল রৌদ্রে আর স্নিগ্ধ বাতাসে নূতন উৎসাহ আর সজীবতা নিয়ে আমরা প্রকাণ্ড একদল শিলংএর যাত্রী মোটর বাসে উঠে বসলাম। পূজোর ভিড় এবার খুব বেশী, আমাদের সঙ্গে কয়েকদল সাহেব-মেম ও কলকাতার কয়েকটি অভিজাত পরিবার ছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি ছিলাম একা। মোটরপথের সঙ্গে রেলষ্টেশনটা কিছু দূর চলে, তারপরে যায় হারিয়ে। এই রেলপথটা আসাম দেশে এবং খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্বতের মর্মে মর্মে আনাগোনা করে। দুর্গম অরণ্য ও পর্বত একে অতিক্রম ক'রে চলতে হয়—কোথায় লামডিং আর বদরপুর, কোথায় ডিব্রুগড় আর তেজপুর—এর অগম্য কোথাও নেই। আমাদের মোটর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে কামাখ্যা পিছনে ফেলে গৌহাটি এসে পৌঁছল।

গৌহাটি শহর ছোট নয়। আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে এই শহরই আসামে সর্বপ্রধান বলা যায়। নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদ, তারই তীরে ছায়াময় পথ। কিন্তু এক শহর অপর শহরের অনুকরণ, সুতরাং বৈচিত্র্য কিছু নেই। শহর থেকে বনজঙ্গল বেশি দূরে নয়। প্রায়ই শোনা যায় ব্যাঘ্র অথবা লেপার্ড অমুক শিকারীর হাতে মারা পড়েছে। সকল জায়গাতেই পর্বতের পাদদেশে সমতল ভূভাগে জন্তু জানোয়ারের উৎপাত বেশি। গৌহাটিতে কিছুক্ষণ থেমে আমাদের মোটর উত্তর দিকে রওনা হোলো।

পথের দু'ধারে চাষ আবাদের কাজ বেশ চলছে। পথটা উঁচু, নীচের দিকে কোথাও জলা ও বিল, কোথাও মরা নদী-নালা। অন্যদিকে অখণ্ড প্রান্তর, দূরান্তরের অরণ্যরেখা উত্তীর্ণ হয়ে পর্বতপথের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। মোটরের ভিতরে ব'সে একজনের বন্ধুত্ব কুড়িয়ে পেলাম, তাঁরই সঙ্গে নানা আলাপে সময় কাটতে লাগলো। দশ-পনেরো মাইল এমনি করেই কেটে গেল। এতক্ষণে খাসিয়া-জয়ন্তীর পাদস্পর্শ করেছি। সমগ্র ভারতে পার্বত্য শহরের সংখ্যা কম নয় এবং সমতল স্থান থেকে সেই সব শহরে পৌঁছবার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর। পাকা মসৃণ পথ দিয়ে গাড়ী চলেছে, দু'ধারের অরণ্য ঘন হয়ে উঠছে। পথটাই আমাদের ভ্রমণ, পথ পার হওয়াটাই আনন্দ। ঠিক এমনি পথটাই গেছে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং, কাল্‌কা থেকে শিমলা, হল্‌দোয়ানি থেকে নৈনীতাল হয়ে রাণীক্ষেত, দেরাদুন থেকে মুসৌরী—আজকের এই পথটাও সেই সকল পথের পুনরাবৃত্তি। মাঝে মাঝে অরণ্যের অবকাশে ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ প্রান্তর, বনময় গ্রাম, কোথাও কোথাও জানোয়ার শিকারের মাচা-বাঁধা এক একটা কেন্দ্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য এই পথটিতে অজস্র। পাখীর কলকূজন, নির্ঝরের মনমর্মর, কোথাও অরণ্যপুষ্পের বিচিত্র মিষ্ট গন্ধ. কোথাও কাঁচা কমলার ঝোপ

কোথাও বা গোলাপের কুঞ্জকানন।

গৌহাটি থেকে শিলং ষাট মাইলের উপর। বেলা বারোটার পর আমাদের গাড়ী শিলং শহরে এসে থামলো। এই শহর আসামের রাজধানী—শীত ও গ্রীষ্মে এর লোক সংখ্যা সামান্যই কমে বাড়ে। ভারতবর্ষে আর কোথাও এমন ব্যবস্থা নেই। স্থায়ী রাজধানী হওয়ার জন্য এখানকার সকল ব্যবস্থাই স্থায়ী। প্রধান সমস্যা পূর্ত বিভাগ ও পানীয় জল, পাকা বাড়ী, যানবাহন, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি। বলা বাহুল্য সকল ব্যবস্থাই নিখুঁৎ। এখানে বহু শত পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পথ ঘাট দার্জিলিং অথবা শিমলার ন্যায় অতিরিক্ত অসমতল নয়, সেজন্য অনেক সময় মনে হয় আমরা সমতলেই আছি, পার্বত্য শহর ব'লে মনে হয় না! ঘোড়দৌড়ের মাঠ, খেলা করবার মাঠ, চমৎকার বাগান ও জলাশয়, বড় বড় ক্লাব—কোনো কিছুর অভাব নেই। নিকটে বিডন ফল নামক একটি জলপ্রপাতকে কৃত্রিম উপায়ে এক বাঙালী কোম্পানী পানীয় জল সরবরাহের কাজে লাগিয়েছেন—সেই জায়গাটি অতি মনোরম। কিন্তু শিলংএর সকলের বড় আকর্ষণ হোলো ফল ও ফুলের বাগান। যেখানে যতদূর যাও, লাল ফুলের অপূর্ব সমারোহ। রাঙা পথ, রাঙা মাটি, রাঙা মেয়ের মুখ, রাঙা তরীতরকারী। চারিদিকে ভ্রমণ করো, কোথাও কিছুর বাধা নেই। সারাদিন কোনো কাননে ব'সে পাখীর গান শোনো, নির্জন পাইন আর ইউক্যালিপ্‌টসের বনে অবাধে ভ্রমণ ক'রে বেড়াও, পর্বতের কোনো নিভৃত স্থানে গিয়ে নির্ঝরিণীর অশ্রান্ত কলধ্বনি শোনো, কমলা ও দাড়িম্বের উদ্যানে বিচরণ করো, তোমার কাছে কৈফিয়ৎ নেবার কেউ নেই। আবার এই শহর ছেড়ে যাও দূরে কোনো গভীর অরণ্যে, বন্ধুর সঙ্গে কোনো নিভৃত পর্বতের ধারে গাছের ছায়ায় গিয়ে বনভোজন করো—সুন্দর সময় কাটবে। আরো

দূরে যাও গহন অরণ্যে—বন্দুক নিয়ে জানোয়ার শিকার করো, দুঃসাহসের পরিচয় দাও, স্বাস্থ্য ও শক্তির উজ্জীবন হবে। যারা দুর্বল, অসুস্থ ও মেরুদণ্ডহীন, অরণ্য ও পর্বতভ্রমণ তাদের জন্য নয়, তারা ভালো ছেলে হয়ে থাক্ ঘরের মধ্যে, তারা পরীক্ষায় পাশ করুক—বাইরের বৃহৎ পৃথিবী, প্রকৃতির দুর্গম রহস্যের সংবাদ তাদের জন্য নয়।

শিলং থেকে মাইল দশেকের মধ্যে হস্তীপ্রপাত। চেরাপুঞ্জী যাওয়ার পথে এক অরণ্যের ভিতরে এই প্রপাতটি অতি মনোরম। বিশাল বিস্তৃত জলরাশি ঘর্ঘরধ্বনিতে উপর থেকে নীচে নামছে, জলের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়। এখানে বহু লোক ক্যামেরা হাতে নিয়ে আসে, ছবি তুলে নিয়ে যায়।

চেরাপুঞ্জী শিলং থেকে চৌত্রিশ মাইল পার্বত্য পথ। পথ অতি ভীষণ। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। পাহাড়ের কার্নিশ বেয়ে যখন গাড়ী ছোটে বুকের মধ্যে দুরু-দুরু করে। বিশেষ কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইলের ভিতরে যে সঙ্কীর্ণ পথরেখায় মোটর চলে সেখানে প্রাণ সংশয়। কত গাড়ী, কত যাত্রী এই পথে অতল গভীর পর্বতের খাদে প'ড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এদিকে চূণের পাহাড় অনেক দেখা যায়। চেরাপুঞ্জী শহর অতি ক্ষুদ্র, বৃষ্টিপাতের উৎপাতে স্থায়ী বসতি সামান্য। এক আধটি গ্রাম, দুই চারিটি সরকারি বাংলো, একটি ছোট বাজার,—এ ছাড়া দূরের থেকে মালপত্র আমদানি রপ্তানির জন্য চেরাপুঞ্জীর নিকটে একটি রজ্জুপথ দেখা যায়; সুরমা উপত্যকায় ভোলাগঞ্জ নামক বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে নানারকম জিনিসপত্র আসে। কৌশলটা অতি বিচিত্র, বহু যাত্রী এই কৌশলটির নিকটে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। চেরাপুঞ্জীর নিকটে দাঁড়ালে দূরে সুরমা উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়।

অস্পষ্ট ও কুহেলিকাময় দিগন্তজোড়া সমতল ভূভাগ, বহু নদী ও নদ, অরণ্যময় বিন্দু বিন্দু শহর—কিন্তু কিছুই সঠিক অনুধাবন করা যায় না। কার্সিয়ং থেকে যেমন অস্পষ্ট উত্তর বঙ্গের সমতল দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। এখানকার পর্বতগাত্র অতি বৃহৎ, অসংখ্য ঝরণা সেই গাত্রগুলি বেয়ে সাপের মতো নীচের দিকে নামছে। চেরাপুঞ্জীকে খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্বতের শেষপ্রান্ত বলা চলে।

আসামে ছিলাম অল্পদিন। দেখেছি সেখানকার পর্বতের নানা শাখা প্রশাখার পথ ধ'রে তেজপুর, মণিপুর, আগরতলা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। ভ্রমণকারীর পক্ষে সমগ্র আসাম অতি তৃপ্তিদায়ক। আমার হাতে সময় অল্প, সাতদিনের বেশি থাকা সম্ভব নয়। কয়েকদিন পরেই আসামের স্বপ্নময় রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে অক্টোবরের এক দুর্দান্ত বর্ষার দিনে কুয়াসার ঘোম্‌টার তলা দিয়ে আমি শিলং থেকে পুনরায় গৌহাটির দিকে রওনা হলাম।

পাণ্ডুঘাট পৌঁছবার পূর্বে উমানন্দ ভৈরব ও কামাখ্যাদেবীর দর্শনলাভের আশা মনে ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় প্রায় এক মাইল খাড়া পাহাড়ের উপরে উঠে ক্ষুদ্র কামাখ্যা গ্রামের একটি পাণ্ডার বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া গেল। তিনি উৎকৃষ্ট ভোজনের আয়োজন করলেন। সে রাত্রে অতি আনন্দে তাঁর দ্বিতল বাসাটির এক কক্ষে নিদ্রা দিলাম।

সকালবেলা উঠে গ্রাম ও মন্দির দর্শনে বাহির হওয়া গেল। অতি অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পথ ঘাট। ভারতের বহু তীর্থস্থান এইরূপ নোংরায় চিরদিন অভিশপ্ত—কিন্তু দেবদেবীর দোহাই দিয়ে এই নোংরামি অবাধে চ'লে যায়। মন্দিরটি বৃহৎ, ভিতরে দেবী মূর্তি। তারই পাশে এক অন্ধকার গুহার নীচে পীঠস্থান, আলো হাতে নিয়ে নামতে হয়। এখানে কুমারী পূজা করা বিধি। স্ত্রীলোক

ভিখারীর উৎপাতে বড়ই বিব্রত হ'তে হয়। প্রতি বৎসর অম্বুবাচির সময় এই গ্রামে বৃহৎ মেলা বসে।

তীর্থস্থান হলেও এবং আমি একজন পাকা তীর্থযাত্রী হওয়া সত্বেও কামাখ্যা আমার ভালো লাগেনি, আশা করি দেবী ক্ষমা করবেন। যাই হোক, পরদিন অন্যান্য স্থান, পর্বতশীর্ষে ভুবনেশ্বরী দর্শন সমাপ্ত ক'রে অপরাহ্নবেলায় কামাখ্যা ত্যাগ করা গেল।

পাণ্ডুঘাট এসে পৌঁছলাম, তখন সূর্যদেব নামছেন অস্তাচলে। ব্রহ্মপুত্র রক্তাভ হ'য়ে উঠেছে। সূর্যাস্তকালে সেই উদার গম্ভীর আসাম দেশকে মনে মনে বিদায় জানালাম। একদিকে হিমালয়ের ভৈরব মূর্তি, অন্যদিকে জয়ন্তীর লাবণ্যশোভা—সেই যুগল মূর্তির পদপ্রান্তে তপস্যায় বসেছেন ব্রহ্মপুত্র। তৃপ্তিতে আমার চক্ষু ভ'রে এলো। ষ্টীমার ছাড়লো।

নেপাল

প্রথম হাওড়া থেকে মোকামা। মোকামা থেকে ষ্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে সামরিয়া ঘাট। সেখান থেকে ট্রেণ ছুটলো বারুণী আর মুজাফ্ফরপুর হয়ে সগৌলি। সগৌলিতে গাড়ী বদল করে সোজা রক্সওল্। সেখান থেকে নেপাল গবর্ণমেণ্টের ট্রেনে উঠতে হয়।

নেপালে যেতে গেলে সরকারি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়, সে হাঙ্গামাকে এড়াবার উপায় হচ্চে শিবরাত্রির সপ্তাহে ওখানে যাওয়া। সকলেরই তখন অবারিত গতিবিধি। প্রবেশ-পথের মুখে টিকিট পাওয়া যায়, তাই দেখিয়ে নেপালে প্রবেশ কর অথবা নেপাল থেকে চলে এসো। সকল আইনেই একটা কিছু ফাঁকি থাকে।

রক্সওল্ থেকে বীরগঞ্জ এবং বীরগঞ্জ থেকে অম্লেকগঞ্জ, এইটুকু মাত্র নেপালের রেলপথ। বীরগঞ্জ থেকে পথ জঙ্গলময়। অমলেকগঞ্জ একেবারে হিমালয়ের পাদদেশে। ছোট্ট একটি সামান্য সহর। অম্লেকগঞ্জ থেকে মোটরলরী পাওয়া যায়, সেই মোটর পাহাড়ের পথ দিয়ে ছুটতে থাকে।

মাইল পঁচিশেক পথ। আঁকাবাঁকা চলেছে সে-পথ পাহাড়ের গা-বেয়ে। প্রথম-প্রথম দু'পাশে পাহাড়ের বিস্তৃত সানুদেশ, তারপর পথ হ'য়ে আসে সঙ্কীর্ণ, পাহাড়ের গভীরে গিয়ে ঢোকে। ক্রমে-ক্রমে পাওয়া যায় সাঁওতাল পরগণার মতো ঘন শালের জঙ্গল, রাঙা মাটি। জঙ্গল শেষ হতে না হতেই নদী দেখা যায়। নদীর নাম বাঘমতি। বাঘমতির তীরে-তীরে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে মোটর ছুটে চলে। নদীর

পারে পারে চাষীদের ছোট-ছোট একাকী কুটীর, আশেপাশে শ্বেত-করবীর এক-একটা ঝাড় এবং তারই পিছনদিকে হিমালয়ের মহাযোগী ধ্যানগম্ভীর মূর্তি, অরণ্যের জটায় জটিল পর্বত চূড়া।

গাড়ী এসে থামল ভীমপেডিতে। সমতল ভূমির পরে পাহাড়ি শহর। পথের দু'পাশে কয়েকটি পাকা সরকারি ধর্মশালা, গুটিকয়েক দোকান, একটি মন্দির। শিবরাত্রির সময়ে এখানে যাত্রীর ভিড় হয়।

ভীমপেডি থেকে হাঁটা পথ। উত্তর দিকে কিছুদূর গিয়ে বাঘমতি নদী পার হ'তে হয়। শীতের শেষ, নদীর ধারাটি শীর্ণ। নদী পার হয়েই চড়াই পথ উঠেচে পাহাড়ে। অত্যন্ত কর্কশ এবং ছায়ালেশহীন। সামান্য কয়েক পা উঠতে না উঠতেই শ্রান্তিতে সর্বশরীর প্রতিবাদ করে ওঠে। এই পাহাড়ের নাম সিসাগড়ি—সম্ভবতঃ পূর্বে এর বিশুদ্ধ নাম ছিল শ্রীশগিরি।

কিছু দূর উঠে গিয়ে পাওয়া যায় নেপালের পাহাড়ি রজ্জুপথ। ইংরাজীতে এর নাম Air Rope-way. দুর্গম পর্বত অতিক্রম করে রাজ্যের মালপত্র আমদানি-রপ্তানি করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার; কুলি এবং ঘোড়ার দ্বারা সব সময় সম্ভব নয়, তাই এই রজ্জুপথের ব্যবস্থা। 'রোপওয়ে' অনেকটা টেলিগ্রাফের তারের মতো, তবে এর ইস্পাতের তারগুলি যথেষ্ট মোটা এবং শক্ত—মাঝে-মাঝে পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় পোষ্ট্ পোতা, তারই মাথায় লাগানো লোহার কপিকলের সাহায্যে তারগুলি ছুটোছুটি করতে থাকে। সেই লোহার দড়িতে গুরুভার মালপত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং ইলেক্ট্রিকের সাহায্যে সেগুলি পরমানন্দে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যাতায়াত করে। আন্দাজে বোঝা গেল, তিরিশ থেকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত এই রজ্জুপথটি দীর্ঘ।

পথে ঝর্ণার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, নেই বললেই হয় এবং যদিই বা এক-আধটা পাওয়া যায়, তার জল অস্বাস্থ্যকর। পথে আহারাদির

ব্যবস্থা করা কঠিন, রান্না-বান্নার আয়োজন করার নানা অসুবিধা, বাঙালী-জিহ্বার অনুযায়ী খাদ্যবস্তুও মেলে না—অত্যন্ত দুরবস্থার ভিতর দিয়ে পথ হাঁটতে হয়। মাইল পাঁচেক পথ উঠে এসে পাওয়া যায় নেপাল-সরকারের গোরা-ছাউনি। নেপাল-পাহাড়ের নানা জায়গায় এমনি এক-একদল সৈন্য নিরন্তর পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

পাঁচ ছ' ঘণ্টা পাহাড় ভেঙে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা একটা বড় পাহাড়ি বস্তিতে এসে পৌঁছলাম। বস্তিটির নাম কুলেখানি। নিকটেই প্রকাণ্ড একটা ধর্মশালা, তার ঠিক নীচেই খরস্রোতা বাঘমতি; নদীর পাড়ে কয়েকটি তাবু উপ্‌রি-সংখ্যক যাত্রীদের জন্য খাটানো রয়েচে—আশেপাশে দু'চারখানি অস্থায়ী দোকান। শীতের হাওয়ায় সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা যায় না। ক্রমশঃ আমরা তুষার-রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেচি।

স্থানাভাবে তাঁবুর ভিতরে অতি কষ্টে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে কুলেখানি ত্যাগ করে গেলাম। পথ এবার চড়াই এবং উৎরাই, কখনো উঠ্‌চে কখনো বা নাম্‌চে। পথের খেয়ালেই আমরা চল্‌চি, সে যেমন ইচ্ছে আমাদের ঘোরাতে-ফেরাতে পারে, আমরা তার অনুগত।

কুলেখানির পরে মাইল তিনেকের মধ্যে দু'বার নদী পার হ'তে হয়। একটির নাম বড় নদী, অন্যটি আমাদের বাঘমতি। পাহাড়ের পথে যেতে নদী পার হলেই সাধারণতঃ চড়াই সুরু হয়, পাহাড়ে তখন হামাগুড়ি দিয়ে ওঠা অতিরিক্ত পীড়াদায়ক। বড় নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভাটি সুন্দর এবং নয়নাভিরাম। সম্মুখের পর্বত-চূড়ায় যখন পিপীলিকা শ্রেণীর মতো যাত্রীর দল সার গেঁথে ওঠে, তখন মনে হয় তারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করতে চলেচে। পথের কষ্টকে শরীরের পরিশ্রমে যারা জয় করতে পেরেচে, তারাই জানে দুঃখের পরে আনন্দের চেহারাটি কেমন!

তারপরেই সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উঁচু-নীচু পার্বত্য পথ। দক্ষিণে থাকে বাঘমতি, ওপারে পাহাড়ের গায়ে চাষীর ঘর, তারপরেই টিরাইয়ের ঘন অরণ্য। হাঁটতে হাঁটতে আবার পেলাম বড় পাহাড়ি বস্তি। একটি বড় ধর্মশালা, তেমনি কয়েকটি দোকান। বস্তিটির নাম চেংলাঙ্। এই থেকে আবার একটি বিরাট পর্বত ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠেচে। পাহাড়টার নাম চন্দ্রাগিরি। চূড়ার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমরা ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। বেলা তখন চারটে! এইটুকু বেলার মধ্যে ওই পাহাড় আমরা পার হতে পারবো না, পর্বতের অন্ধকার অরণ্যে পথ দেখতে পাবো না, কোথাও রাত্রির আশ্রয় নেই, তা ছাড়া হিংস্র বন্য জন্তুর জন্য টিরাইয়ের বন চিরবিখ্যাত। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই সঙ্গে, একহাতে একখানি কম্বল, অন্য হাতে একটি ছড়ি। হঠাৎ যদি কোথাও 'হালুম্' শুনি, তখন ছড়িটিও হাত থেকে খসে যাবে। কম্বল নিয়ে আর বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে না! থাক্ দরকার নেই। সেদিনের মতো ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম। ভিতরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়েচে, চীৎকার আর কোলাহল। শীত একেবারে প্রচণ্ড, শরীরে কাঁপুনি ধরে।

পরদিন প্রভাতে উঠেই চন্দ্রাগিরির চড়াই ধরলাম। সকলেই জানি, আজ সারাদিনের মধ্যে যখনই হোক নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু পৌঁছাতে হবে। বাল্যকালে জিয়োগ্রাফিতে পড়তাম, 'Katmandu, Capital of Nepal, Situated on the Himalayas' সেদিন বন্ধু-মহলে কাট্‌মাণ্ডুকে 'কাটামুণ্ডু' নাম দিয়ে কত উল্লাস করে বেড়িয়েছি। নেপালের কথা ভাবলেই মনে হত সে কবন্ধ, তার মাথা গেচে। আজ সেই কাটামুণ্ডুতে পৌঁছবো।

চন্দ্রাগিরির চূড়ায় উঠতে প্রায় ন'টা বাজল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েচি। কিন্তু চূড়ায় উঠেই দূর উত্তরে যে আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল,

তাতে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সূর্যের কিরণে তুষারময় দুগ্ধশুভ্র হিমালয় ঝলমল করচে, তার কোলে কোথাও কোথাও মেঘগুলি আসন পেতে বসেচে। উপরে নীলাভ পরিচ্ছন্ন আকাশ। অনির্বচনীয় মহিমায় চিরদিনই বিস্ময়কর। দুই চক্ষু ভরে একবার সেই ধবলজটা উদাসীন সন্ন্যাসীকে দেখে নিলাম।

তারপরেই উৎরাই পথে নামা সুরু। পথ অত্যন্ত বিশ্রী এবং প্রস্তরসঙ্কুল। দক্ষিণে গভীর খাদ্। দিনের বেলাতেও অরণ্যের ছায়ায় কোথাও কোথাও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। উপর দিয়ে রজ্জুপথে মালপত্র আমদানী-রপ্তানি চল্‌চে।

দীর্ঘ দু'ঘণ্টাকাল গড়গড়িয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে থান্‌কোটে এসে পৌঁছলাম। থান্‌কোট থেকে কাট্‌মাণ্ডু ছ' মাইল পথ। অনেক যাত্রি হেঁটে চলেচে। আমরা উঠলাম মোটর বাস-এ। পথ এবার প্রায় সমতল, কিন্তু সমতল হলেও অত্যন্ত কর্কশ এবং বন্ধুর। গাড়ী ছুটতে থাকলে ভয় হয়, এই বুঝি ওল্‌টায়। শোনা গেল এখানকার মোটরের তলায় কোনো মানুষ চাপা পড়ে মরে গেলে ড্রাইভারের পনেরো শো টাকা জরিমানা হয়।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় গাড়ী কাট্‌মাণ্ডু শহরে প্রবেশ করল। শহরের প্রবেশ-পথে বাঘমতি নদীর পাকা পুল পার হতে হয়। প্রথমেই ধারণা হলো শহরটি অত্যন্ত নোংরা ঘিঞ্জি। প্রত্যেক বাড়ীই এখানে এক একটি মন্দিরের মতো। সাধারণ বাড়ীগুলির অন্দর-মহল অতিরিক্ত স্যাঁতসেঁতে, অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর। মধ্যবিত্তরা রোগ-ভোগ নিয়ে ঘর করে। ত্রিপুরেশ্বরের মন্দিরের নিকট গাড়ী এসে দাঁড়ালো। চলাচলের পথের মাঝখানে অনেক জায়গায় এক একটি শিবলিঙ্গ সিঁদুর মেখে পড়ে রয়েচে। কোথাও কোথাও পশু বলি দেওয়া হয়েচে, তারই বীভৎস রক্তের দাগ। সমগ্র ভারতবর্ষে

নেপালই একমাত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য, রাজা তার পরম হিন্দু—কিন্তু এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে ঢুকে প্রথমেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় অনেক খোঁজাখুজির পর এক বাঙালী ডাক্তারের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করলাম। অতি বিনয়ী এবং ভদ্র মানুষটি; নাম, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র দাশগুপ্ত।

চারিদিকে পর্বতমালা, মাঝখানে নীচে কাট্‌মাণ্ডু, তাই এ শহরের স্বাস্থ্য ভাল নয়। যেদিন রোদ ওঠে না, সহরবাসীরা সেদিন কষ্ট পায়। আমাদের বাসার সম্মুখেই সিভিল্ লাইন। স্কুল, কলেজ, আফিস, হাঁসপাতাল, কমাণ্ডার-ইন্-চীফের বাড়ী, পথের উপরে ভীম শম্‌শের জঙ বাহাদুরের একটি প্রস্তর প্রতিমূর্তি। সম্মুখে কলিকাতার গড়ের মাঠের মতো একটি বিশাল প্রান্তর, সেখানে হয় সৈনাদের কুচকাওয়াজ ও সখের যুদ্ধ। এপাশে একটি প্রকাণ্ড সরোবর, তার নাম রাণীপুকুর। পুকুরের পারে একটা বড় টাওয়ার ক্লক্। এই ঘড়ির আওয়াজ তিন মাইল দূর পর্যন্ত শোনা যায়। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি সুন্দর পুরাতন মন্দির। এদিকের শহর একটুখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

নেপালীরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত কিন্তু রাজা তাদের ধনবান—ভিতরে কোথায় বৈষম্য আছে। নেপালের রাজার সঙ্গে নেপালের অধিবাসীদের বিশেষ কোনো যোগ নেই। প্রধান মন্ত্রীর নাম মহারাজা, তিনিই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রাজ্য শাসিত হয়। নেপালের সম্রাট নেপালরাজ্যের মধ্যে বন্দী, দেশের সীমানা ছেড়ে এক পা তাঁর বাইরে যাবার নিয়ম নেই, এই প্রথাই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসচে। সম্রাটকে এখানে ধীরাজ বলে, অথবা পাঁচ-সরকার। মহারাজাকে বলে তিন-সরকার। ধীরাজ এবং মহারাজা সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি কানে এল, তাতে মনে হলো দেশটা স্বাধীন হলেও জাতিটা স্বাধীন নয়, আপন দুঃখ ও দৈন্যের প্রতিবিধান করবার স্বাধীনতা

দেশবাসীর হাতে নেই। আপন দেশেই তারা পরাধীন।

নেপালের টাকা পয়সার চেহারা আলাদা। আধ্‌লা, দু-আধ্‌লা, পাঁচ-আধ্‌লা এবং মোহর। আধ্‌লাগুলি তামার তৈরী, চেহারা অতি বিশ্রী, মোহরগুলি রূপার, দাম সওয়া ছ' আনা। নেপালে ডাক এবং তারবিভাগ আলাদা বটে কিন্তু 'বৃটিশ লিগেশনের' হাত দিয়ে তাদের দেশ-বিদেশের চিঠিপত্র যাতায়াত করে। এ সম্বন্ধে স্বাধীন নেপালের নিবুর্দ্ধিতার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

সমস্ত দেশে এখনো অন্ধকার, যুগশিক্ষার আলো কোথাও নেই। তিনটি শ্রেণী নিয়ে দেশ—চাষী, মধ্যবিত্ত এবং রাজপুরুষ। শ্রমিকের সংখ্যা কম। সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক অতি উৎসুক, ওইটিই জনপ্রিয় সরকারী চাক্‌রী। একবার সৈন্যদলে ভর্তি হতে পারলেই—ব্যস্. নিশ্চিন্ত, প্রতিদিন ঘণ্টা দুই প্যারেড্ আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াও—কোথায় কবে যুদ্ধ তার ঠিক নেই। দেশের ঘরে ঘরে রোগ। যক্ষ্মা, হাঁপানি, বেরিবেরি, টাইফয়েড্ এবং গলক্ষত এখানকার সঙ্গের সাথী। ব্যাধি ও অস্বাস্থ্যের আবহাওয়ায় এমন সুন্দর পার্বত্য শহরটির বাতাস ভারাক্রান্ত। নেপালীরা অত্যন্ত নোংরা, বিকৃত তাদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি। কলের জল ভাল নয়, সবাই গরম জল ব্যবহার করে।

যেটুকু শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা নেপালে প্রবেশ করেচে তার জন্য বাঙালীরা দায়ী। স্কুলে, কলেজে, বড় বড় সরকারি দপ্তরে এখনো অনেক বাঙালী নিযুক্ত রয়েচেন। রাজ পরিবারের গৃহশিক্ষক ছিলেন বাঙালী, পোষ্টমাষ্টার বাঙালী, বাঙালী ডাক্তার, বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার—নেপালের আধুনিক ইতিহাসে বাঙালীর কৃতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে। আজও কাট্‌মাণ্ডু থেকে দূরে পর্বতের উপর দারাগাঁর নামক স্থানে যে যক্ষ্মা হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেচে তার সার্ভেয়ার এবং

পরিদর্শকরূপে এক বাঙালী চলেচেন, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুস্তাফী। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল এক পর্বত-চূড়ায় এই একাকী বীর বাঙ্গালী একটি শহর প্রতিষ্ঠা করতে চলেচেন।

কাট্‌মাণ্ডু থেকে পূর্বদিকে আড়াই মাইল দূরে পশুপতিনাথ। যাতায়াতের জন্য মোটর বাস পাওয়া যায়। ভাড়া দু'আনা। শিব-রাত্রির দিনে পশুপতিনাথের মন্দিরে মেলা বসে। নানা দেশ থেকে আসে সাধু-সন্ন্যাসী; বহু যাত্রীর সমাগম হয়। সোনার পাতে মোড়া বিশাল মন্দির, রূপার তোরণ দ্বার, ভিতরে মহাদেবের কৃষ্ণকায় প্রতিমূর্তি। বাইরের চত্বরে প্রকাণ্ড এক সোণার ষাঁড়। আশপাশে অগণ্য পাথরের মন্দির ও শিবলিঙ্গ। পিছন দিকে নীচে বাঘমতি নদীর ধারা। ওপারে রামচন্দ্র ও গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির। মন্দিরটি শাস্ত্রমতে একটি পীঠস্থান। পশুপতির মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে সেদিন সম্রাট ও তাঁর মাতার দর্শন লাভ ঘট্‌লো। সম্রাটের বয়স অতি অল্প, সুপুরুষ একটি যুবক। সম্ভ্রান্ত নেপালীর সঙ্গে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর চেহারার একটি সৌসাদৃশ্য আছে কেন, কে জানে!

এদেশে রাজার ছেলে রাজা হয়, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বেলায় সে নিয়ম নেই। বড় ভাই প্রধান মন্ত্রী, তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ভাই তাঁর আসন দখল করবেন। অতএব স্ত্রী-পুত্রদের জন্য সংস্থান করে যাওয়া প্রত্যেক প্রধান মন্ত্রীর জীবনে একটি সমস্যা। সম্রাটের এ বালাই নেই, তিনি আপন প্রাসাদে নিশ্চিন্ত ও নিভৃত জীবন যাপন করেন। রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই বললেই হয়। পশুপতিনাথ থেকে ফিরবার পথে রাজপ্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হলো। হাঁ, রাজপ্রাসাদই বটে। বিপুল ঐশ্বর্যের ইসারা বিশাল পুরীটির সর্বাঙ্গ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠচে। প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদটিও তাই, তারপরেই কমাণ্ডার-ইন-চীফের প্রাসাদ। বর্তমানে রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে। প্রধান

মন্ত্রী ও প্রতিনিধিসভা রাজ্যশাসন করেন—রাজা ক্ষমতাহীন।

কাট্‌মাণ্ডুর চারিদিকে ছোট ছোট গ্রাম এবং ছোট ছোট শহর। গ্রাম এবং শহরগুলি পর্বতের গায়ে গায়ে চিত্রপটের মতো আঁকা। পাটান্ শহরটির নাম বেশী, তারপরেই স্বয়ম্ভু বৌদ্ধ মন্দির। ওদিকে দূরে দত্তাত্রেয় গ্রান, এদিকে দক্ষিণ-কালী। কোনো গ্রামের নাম নারায়নথান্, তারপর চৌবাহার, কীর্তিপুর।

শিবরাত্রি উপলক্ষে আমাদের এদেশে আসা ; সুতরাং সরকারের বিনা অনুমতিতে বেশীদিন থাকার উপায় নেই। বিধাতার রাজ্য মানুষের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদীর রাষ্ট্রনীতি যেখানে, সেই রাজ্যকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এনেচে, সেখানে রাজার অনুমতি নিয়ে থাকার প্রয়োজনও বোধ করিনে, অহঙ্কারে ও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। শরীরটাও অসুস্থ, অতএব একদিন সকালে আমরা দেশের অভিমুখে যাত্রা করলাম। অন্য পথ আর নেই, সেই একই পথ দিয়ে ফিরে যেতে হবে। বিদায় নেপাল। বিদায় হিমালয়।

দক্ষিণ ভারতের কথা

এবার চলো দক্ষিণ ভারতে--দেব দেউল আর মন্দিরের দেশে, দেখবে ভক্তির কি রূপ, দেখবে কি বিরাট ও মহিমাময় তার পরিকল্পনা। দেবতাকে মানুষ কিভাবে পূজো করে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। শুধু মন্দিরের কারুকার্য ও স্থাপত্য শিল্প নয়। দেবতাদের যা ঐশ্বর্য তা দেখলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করবে। সোণা রূপো, হীরে মুক্তো, মণিমাণিক্যের সে যেন মেলা। ভক্তদের প্রণামী থেকে তিল তিল করে এই কুবেরের ধন সঞ্চিত হয়েছে। অনার্য বলে যাদের লোকে মনে মনে ঘৃণা করে, তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে এর কাছে এলে। শিল্পী মনের যে পরিচয় এই সব মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে, তার 'গোপুরমেয়' তার সিংহ দরজা, তার নাটমন্দিরের প্রতিটি খিলানে, তার অন্তরে বাহিরে সর্বত্র রয়েছে তার তুলনা শুধু ভারতে কেন জগতের স্থাপত্য শিল্পে দুর্লভ। মন্দির বলতে তোমরা বোঝ কালীঘাট, তারকেশ্বর কিম্বা কামাখ্যাদেবীর মন্দির অথবা বড় জোর কাশী গয়া বৃন্দাবনের ; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মন্দির এ সমস্ত কল্পনার অতীত। এ যেন এক একটা গ্রাম, তার মধ্যে বাজার হাট, বাগান বাগিচা, রান্নাবাড়ী, গোলাবাড়ী থেকে শুরু ক'রে মন্দিরের যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রয়োজনের পৃথক পৃথক মহল। বিরাট একটা দুর্গের মত ব্যাপার, তার মধ্যেই আছে সব দুর্গ স্বামী যেন এই দেবতার বিগ্রহ। এ ছাড়া এই মন্দিরগুলো এত বড় ও এত উঁচু যে কথিত আছে পুরীর মন্দিরের মাথায় যে আলো জ্বলে তাই দেখে নাকি লঙ্কায় বিভীষণ একাদশীর দিন

জল গ্রহণ করে। বিদেশী দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যেই এমনি সুরক্ষিত ক'রে এই সব মন্দির তৈরী। তাই বহু প্রাচীর গোপুরম্, সিংহদরজা, বহু চত্বর, বহু সিঁড়ি অতিক্রম করে তবে আসল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়, তারপর অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বহুদূর গেলে তবে মেলে দর্শন। দিবারাত্র প্রদীপ জ্বলে তাই মন্দিরের মধ্যে। তোমরা যদি কোন বিশেষ পর্বদিনে এখানকার মন্দিরে যাও তো শুধু উৎসবের জাঁকজমক নয় দেবতার ধন দৌলত পূর্ণভাবে চোখে দেখবার সুযোগ পাবে। আমি গিয়েছিলুম এমনি একটা উৎসব সময়ে। মাদ্রাজ মেল ছাড়লো হাওড়া ষ্টেশন থেকে, কখন তা ঠিক মনে নেই। মেল ট্রেন ছুটলো উর্ধ্বশ্বাসে, ছোটখাটো কত সব ষ্টেশন পেরিয়ে গেল কোনটাতে থামল না, অবশেষে প্রায় দু'ঘণ্টা পরে এসে দাঁড়ালো খড়্গপুর ষ্টেশনে। এত বড় প্ল্যাটফরম্ ভারতবর্ষে আর কোনস্থানে দেখিনি। বোধহয় একসঙ্গে পর পর পাঁচ-সাতটা সম্পূর্ণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনের মধ্যে সবচেয়ে এই ষ্টেশনটি বেশী প্রয়োজনীয়। এখানে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর বিরাট কারখানা আছে। বহু জাতির বহু লোক এখানে দেখা যায়। চাকুরী উপলক্ষে সবাই এখানে এসে জুটেছে। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সাহেব, এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের কোয়ার্টার চারিদিকে। রেলের এই কারখানাকে উপলক্ষ করেই গড়ে উঠেছে শহরটা।

এর পরেই নামকরা বড় ষ্টেশন হলো বালেশ্বর। তারপর এলো ভদরক। নূতন জায়গায় যখন যাই আমার চোখে ঘুম আসে না। জানালার ধারের বেঞ্চিতে একটা স্থান অধিকার ক'রে বসে থাকি। গাড়ী কত নূতন দেশ, কত নূতন গ্রাম চোখের সামনে ফেলে চলে যায়। চোখে আমার ঘুম নামে না। মন ছোটে ওই দূর গাছপালার মধ্যে যে সরু পায়ে চলা পথ তাই ধরে কোন রহস্যময় অজ্ঞাতে। নূতন

জায়গায় নূতন বিস্ময়। নূতন আকর্ষণ অহরহ আমার মনকে সেইদিকে টানে। সিনেমার দৃশ্যপটের মত ট্রেনের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পর্দায় ছবির যেন শোভাযাত্রা চলে।

হুস্ ক'রে গাড়ী চলে যায় ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছেড়ে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ীর গতি মন্দীভূত হতে হতে সহসা থেমে গেল। কুলিদের চীৎকারে ও যাত্রীদের নামা উঠার ব্যস্ততায় সহজেই বুঝলুম যে একটা বড় ষ্টেশনে এসেছি। ষ্টেশনের নামটা জানবার জন্যে বাইরের দিকে মুখ বাড়াতেই চোখে পড়লো—বিরাট একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে যাজপুর। এখান থেকে বৈতরণী তীর্থ ও বিরজা দেবী যেতে হয়।

এর পরের বড় ষ্টেশন হলো কটক, গাড়ীটা অনেকক্ষণ সেখানে থামলো। তারপর ভুবনেশ্বরে এসে নামলুম। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে ভুবনেশ্বরের মন্দির। দেশ বিদেশের বড় বড় স্থপতিরা এর কারুকার্য ও গঠন বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বহু উচ্ছ্বাস করেছেন। মন্দিরের আকৃতি এত সুন্দর এবং এত উঁচু যে বহুদূর থেকে এর চূড়া দেখা যায়। বিন্দু সরোবর নামে বিরাট জলাশয় এখানের আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানকার গৌরীকুণ্ডের জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। অম্ল, অজীর্ণ ও উদারময় রোগের পক্ষে খুব উপকারী। বহু রোগী তাই এখানে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে আসে।

ভুবনেশ্বর হ'য়ে খুরদা রোড ষ্টেশন থেকে ট্রেন বদল করে তবে পুরী যেতে হয়। মাদ্রাজ মেল পুরী যায় না। খুরদা রোড জংশন থেকে একটা ব্রাঞ্চ লাইন পুরী পর্যন্ত চলে গেছে। সাক্ষী গোপালের মন্দির এই লাইনে পুরীর কয়েকটা ষ্টেশনের আগে। কথিত আছে, বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষী দিতে আসছিলেন তাঁর এক

ভক্তের জন্যে কিন্তু ঐ পর্যন্ত এসেই তিনি থেমে যান। গল্পটি বড় চমৎকার, দুটি লোক একবার বৃন্দাবন যায়। তার মধ্যে একজন ধনী আর একজন দরিদ্র। সহসা ধনীটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় দরিদ্র লোকটি তার খুব সেবা শুশ্রূষা করে। তাই খুসী হয়ে ধনীটি বলে যে সুস্থ হয়ে উঠলে তার কন্যার সঙ্গে দরিদ্র লোকটির ছেলের বিয়ে দেবে। কথাটি যখন হয় তখন সেখানে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু অসুখ ভাল হয়ে গেলে, দেশে ফিরে এসে ধনীটি অস্বীকার করল দরিদ্র লোকটির ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে। তখন সেই দরিদ্র লোকটি রাজ সরকারে নালিশ করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্যে। বিচারক যখন দরিদ্র লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সাক্ষী? সে তখন দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে বৃন্দাবনের গোপাল ছাড়া আর কেউ জানে না সে কথা। তাঁর সামনে মন্দিরে দাড়িয়ে একদিন কথাটা হয়েছিল।

বিচারক বল্লেন, সাক্ষীকে হাজির করতে না পারলে আমি বিশ্বাস করবো না কোন কথা। তখন দরিদ্র লোকটি বৃন্দাবনে চলে গিয়ে গোপালের মন্দিরে 'হোত্যা' দিয়ে পড়লো। স্বপ্নে গোপাল বল্লেন, হ্যাঁ, আমি তোমার হয়ে সাক্ষী দিতে যাবো, তুমি ফিরে যাও। দরিদ্রটি কেঁদে বললে, ঠাকুর আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। স্বপ্ন হলো, বেশ আমি যাবো তবে একটি সর্তে—তুমি আগে আগে যাবে, আমি তোমার পিছনে পিছনে চলবো কিন্তু তুমি একবারও পিছন ফিরে তাকাতে পাববে না। যদি তাকাও তাহলে যেখানে তাকাবে সেইখান পর্যন্তই আমি যাবো। ভক্ত আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু আমি কেমন করে জান্‌বো যে তুমি আমার পিছনে আস্‌ছো। ঠাকুর বল্‌লেন, আমার পায়ের নূপুরের ধ্বনি তুমি শুনতে পাবে। ভক্ত চলে আগে আগে আর ঠাকুরের নূপুরের ধ্বনি চলে পিছনে পিছনে।

এমনি ভাবে মাঠ ঘাট নদী পেরিয়ে তারা চল্‌লো। দরিদ্রটি তখন মনে মনে ভাবতে লাগলো, এইবার যাবে কোথায় বিয়ে ত দিতেই হবে, আমার ছেলের সঙ্গে। ধনীর কন্যা কত ধন দৌলত, কত মান সম্ভ্রম নিয়ে আস্‌বে তার পুত্রবধূ হয়ে। সমাজে তার মর্যাদা কি রকম বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি আকাশ কুসুম রচনা করতে লাগল। সহসা এক সময় সে চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। একি! নূপুরের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। তবে কি ঠাকুর চলে গেল। এই মনে করে পিছন ফিরতেই ঠাকুর সেখানে পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর এক পাও তাঁকে নড়াতে পারল না। বেচারী ভক্তের ত পাগলের মত অবস্থা। ঠাকুর ঠিকই আসছিলেন বালির পথ বলে চলতে গিয়ে পা বালির মধ্যে বসে যাচ্ছিল তাই নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। হায় হায় করতে করতে তখন দরিদ্র লোকটি বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু গোপাল সেখানে অচল অটল হয়ে রইলেন। সাক্ষী গোপাল সম্বন্ধে এমনি গল্প প্রচলিত আছে। এখন খুব ধুমধাম ক'রে সেখানে পূজা অর্চনা হয়। তাঁর মন্দিরে ভক্তদের ভীড় অনবরতই লেগে থাকে।

এর কয়েকটা ষ্টেশন পরেই পুরী। মালতী পাতপুর ষ্টেশন থেকেই জগন্নাথ দেবের বিখ্যাত মন্দিরের চূড়াটি দেখা যায়। চারিদিকে নারিকেল কুঞ্জ, তারি মধ্যে দিয়ে উঁকি মারে সাদা রঙের মাথাটি। যাত্রীরা সব জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে 'জয় জগন্নাথদেব কি' বলে চেঁচিয়ে উঠে।

পুরীর রেল ষ্টেশন থেকে দু'মাইল দূরে শহর। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই যদিও সহরটা গড়ে উঠেছে তবু আসল শহর বলতে এখন সমুদ্রের তীরকেই বোঝায়। দক্ষিণে অনন্ত নীল সমুদ্র আর তারি তীরে সোণালী রঙের বালুভূমি চিক্ চিক্ করে, নীলাম্বরী সাড়ীতে

সোণালী জরির পাতের মত। ঊর্ধে অনন্ত উদার আকাশ যেন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে—তারই দিকে যুগ যুগান্তর ধরে। সমুদ্রের রূপ এমন সুন্দর ও এমন ভয়ঙ্কর পুরী ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের আরও বহু স্থান থেকে সমুদ্রকে দেখা যায় কিন্তু এ রকম অত্যাশ্চর্য তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ গর্জমান মূর্তি আর চোখে পড়ে না।

মানুষ সুন্দরের উপাসক, তাই দিবারাত্র এই সুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে সমুদ্রের তীরে এসে বাসা বেঁধেছে। কত অট্টালিকা কত সৌধমালা ধনী ও দরিদ্রের ছোট-বড় কত বাড়ী, যেন বাড়ীর ভীড় লেগে গেছে এখানের সমুদ্রের তীরে। পুরীর ষ্টেশনের কাছ থেকে এই অট্টালিকা শ্রেণী শুরু হয়েছে এবং সমুদ্রের ধার দিয়ে প্রায় চার মাইল চলে গিয়েছে। চক্রতীর্থ থেকে হরিণ চৌবা পর্যন্ত বালির সমুদ্রের মধ্যে যেন অগণিত ঢেউ উঠেছে এই বাড়ীগুলি। সমুদ্রের বালুময় তীরে সর্বত্রই লোক স্নান করে তবে এর মধ্যে স্বর্গদ্বার হ'লো তীর্থ যাত্রীদের কাছে সর্বাপেক্ষা পুণ্যময় স্থান। এর ঘাটে তারা স্নান করে, পূজা অর্ঘ্য, শ্রাদ্ধ শান্তি প্রভৃতি পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করে। জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহ দরজা থেকে সোজা যে রাস্তাটি বরাবর দক্ষিণে এসে সমুদ্রে পড়েছে সেখানটাকে বলে স্বর্গদ্বার। এই রাস্তার দু'ধারে ছোট বড় অসংখ্য দেব-দেবীর মন্দির দেখা যায়। স্বর্গদ্বার থেকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। যাত্রীরা জগন্নাথ দর্শন করে এই পথ দিয়ে স্বর্গদ্বারে গিয়ে স্নান তর্পণ প্রভৃতি করে। পুরীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর সমুদ্র এবং এর দেবতা। একদিকে বিরাট সমুদ্র আর একদিকে বিরাট মন্দিরের বিরাট দেবতা, দারুভূত মুরারী, দুই বিরাটের যেন মহামিলন। তাই মানুষ এখানে এসে ভুলে যায় তার অন্তরের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, ছোট বড় ভেদাভেদ জ্ঞান সব। মানুষ যে এক, একই মহা মানবের অংশ

এই কথাটাই যেন তখন মনে হয়, তাই জগন্নাথদেবের ভোগ বা প্রসাদে কোন জাত বিচার নেই। পরম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে যদি অতি নীচ জাতীয় চাঁড়াল হাতে করে প্রসাদ দেয় ত তিনি সানন্দে তার হাত থেকে তা নিয়ে মুখে দেন। না বলাটাই এখানে পাপ। এ অদ্ভুত স্থান। হিন্দু বিধবাদের এখানে এলে একাদশীর উপবাস করতে হয় না। তারা যতবার ইচ্ছা জগন্নাথদেবের প্রসাদ—ভাত ডাল তরকারী মিষ্টান্ন খেতে পারেন। পুরীর অপর নাম তাই শ্রীক্ষেত্র—মহা মিলনের স্থান।

পুরীর সবচেয়ে বড় উৎসব হ'লো জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। এছাড়া স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতিতেও খুব জাঁকজমক হয়। রথযাত্রার সময় লক্ষ লক্ষ লোক আসে ভারতবর্ষের সকল স্থান থেকে।

পুরী দেখা শেষ করে আবার ফিরে আসতে হয় খুরদা রোড ষ্টেশনে। সেখান থেকে আবার মাদ্রাজ মেল ধরে দক্ষিণ ভারতের পথে যাত্রা করতে হয়। প্রথমেই পড়ে ভাইজাগ্ বা ভিজাগাপট্টম। এখান থেকে গাড়ী বদল ক'রে যেতে হয় ওয়ালটেয়ার। ওয়ালটেয়ারের দ্রষ্টব্য স্থান হলো 'ডলকিনস্ নোজ'। এখানে পাহাড়ী বেলা ভূমিতে সমুদ্র আছড়ে পড়ে। শুধু ভ্রমণ ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। সাহেবেরা এই জায়গাটাকে বেশী পছন্দ করে।

হিন্দুদের তীর্থ হ'লো সিমাচলম্ বা সিংহাচলম্। এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। পাহাড়ের ওপর প্রায় সাতশ' পঞ্চাশটি সিঁড়ি বেয়ে তবে মন্দিরে উঠতে হয়। এখানে যেতে হয় ভাইজাগ বন্দর থেকে।

এর পর রাজমাহেন্দ্রী। গোদাবরী তীর্থে যেতে হলে এখানে নামতে হয়। গোদাবরীতে স্নানই হ'লো এর প্রধান পুণ্য কর্ম।

এখানে আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নেই ; তাই তাড়াতাড়ি এই জায়গা থেকে লোক পালায়।

তাছাড়া এইদিকে মানে এই লাইনটাতেই খাদ্য খাবারের বড় অসুবিধা, বিশেষ করে বাঙালীদের। এ অঞ্চলে যে সব খাবার পাওয়া যায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে তার পরিচয় অত্যন্ত কম। এদিকে চা পাওয়া যায় না, তার বদলে বিক্রী হয় কফি। পুরী কচুরী লাড্ডু মিঠাই দই রাবড়ী—পশ্চিম ভ্রমণ করতে গেলে যা প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়, তার নাম গন্ধ এদিকে নেই। ভাত, পাতলা জলের মত ডাল, নারকেল তেলে ভাজা অদ্ভুত ধরণের দু'একটা দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী, তেঁতুলের টক্ আর চালের গুঁড়ি থেকে তৈরী এক রকমের আস্ত পিঠে সাধারণতঃ এই খাদ্যই বিক্রি হয় রেলের স্টেশনে এবং অধিকাংশ জায়গায়।

বড় শহর মাদ্রাজ। তাই এখানে কিছু সভ্য খাবার-দাবার তবুও মেলে। কদাচিৎ হয়তো বা একটা চায়ের দোকান রেস্তোরাঁ, চপ্ কাটলেট, কিছু বা ভাল মিষ্টান্ন চোখে পড়ে। মাদ্রাজ জায়গাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাদ্রাজী স্ত্রী পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদগুলিও বেশ রুচিসম্মত। মেয়েদের পরনে কাছা দেওয়া দীর্ঘ সাড়ী, কানে ও নাকে হীরের অলঙ্কার, আর পুরুষদের লুঙ্গির মত সাদা কাপড়, গায়ে জামার উপর একখানি করে পাটকরা চাদর এবং কানে হীরের গয়না। যে যত বড়লোক তার গায়ের চাদর আর হীরে তত মুল্যবান, এ ছাড়া ধনী ও দরিদ্রের বেশভূষায় বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য হয় না। বাঙ্গালীর মেয়েদের সঙ্গে মাদ্রাজী মেয়েদের মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে। মাদ্রাজ শহরটা—ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে সেখানকার ট্রিপ্লিকেন-একোয়ারিয়াম বা জলজ মিউজিয়াম দেখে চিংলিপুট রওনা হতে হয়। চিংলিপুট মাদ্রাজের কাছেই। সেখান থেকে বাসে চেপে যেতে

হয় পক্ষীতীর্থম। পাহাড়ের ওপর প্রত্যহ একই সময়ে আসে দু'টি পাখী। দূর আকাশের গায়ে প্রথমে চিলের মত দু'টি সাদারঙের পাখী দেখা যায় তারপর ঘুরতে ঘুরতে তারা নেমে আসে সেই পাহাড়ের ওপর। সেখানে তাদের জন্য থালায় করে ভোগ সাজানো থাকে। তারা এসে তাই খেয়ে যায়। স্মরণাতীত যুগ থেকে নাকি এই দু'টি পাখী এমনি ভাবে আসছে। লোকের বিশ্বাস ওরা পাখী নয়—পক্ষীরূপী কোন দেবদেবী। তাই তাদের ভক্তিভরে তারা ভোগ দেয়।

এখান থেকে অল্প খরচায় আরো একটি তীর্থে যাওয়া যায় তার নাম মহাবলীপুরম্। আমাদের দেশের ছই ঢাকা যেমন গরুর গাড়ী, ওদেশে তেমনি গো-যানকে বলে ঝটকা, এই ঝটকাটিই সব জায়গায় সব সময় পাওয়া যায় এবং খরচাও হয় তাতে কম। হ্যাঁ, এইসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রেখো যে, সম্প্রতি আর একটি সর্বাপেক্ষা বড় তীর্থস্থান এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। সে তীর্থস্থানের দেবতা আমাদের মত একজন মানুষ এবং সবচেয়ে গৌরবের কথা তিনি বাঙ্গালী। আজ শুধু বাঙ্গলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিতরা তাঁকে পূজো করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। এঁর নাম সকলেই নিশ্চয় শুনেছ। ইনি সর্বজনপূজ্য শ্রীঅরবিন্দ। ঋষি অরবিন্দ নামে যিনি আজ অধ্যাত্ম জগতে পরিচিত। তাঁকে দর্শন করবার জন্য দেশ বিদেশ থেকে লোক প্রতিবছর তাঁর, আশ্রমে ছুটে আসত। এই পথে ভিল্লুপুরম্ নামে একটি ষ্টেশন আছে সেখান থেকে নেমে ষ্টীমারে চেপে পণ্ডিচেরী যেতে হয়। এই পণ্ডিচেরী হ'লো শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে এখন এই আশ্রমে বাস করছেন।

পথে আরো যে সব তীর্থ পড়ে তার মধ্যে কাঞ্জীভেরম্, কুম্ভকোনম্,

ত্রিপাতি বালাজী, চিদম্বরম্, মাদুরা, শ্রীরামেশ্বরম্, তাঞ্জোর প্রভৃতি সবচেয়ে বিখ্যাত।

কাঞ্জীভেরম্, সপ্ততীর্থের এক তীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী প্রভৃতি যে সাতটি তীর্থের উল্লেখ আছে পুরাণে, তারই একটি হলো এই কাঞ্জীভেরম্।

কুম্ভকোনম্, এখানে মাঘ মাসে এক বিরাট মেলা হয়, ও অঞ্চলে তাকে বলে "মহামাঘম্"। ত্রিপতি বালাজীর মন্দিরে যেতে হলে তিরুভনমালাই ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়। এখানকার সব মন্দির-গুলোই বড় এবং অদ্ভুত কারুকার্য খচিত। তবে গোপুরম্ বা সিংহদ্বার সব মন্দিরের সমান নয়, কোনটা বেশী উঁচু কোনটা বা কম। কিন্তু আয়তনে কেউ-ই কম যায় না।

ট্রেনে যেতে যেতে বেশ বোঝা যায় কখন একটা সভ্যতা ছেড়ে আর একটা সভ্যতার মধ্যে এসে পড়েছি। মাদ্রাজের আগে পর্যন্ত ছিল অন্ধ্রসভ্যতা, কিন্তু তারপর থেকে শুরু হয়েছে দ্রাবিড় সভ্যতা, গাড়ীতে এবার যারা উঠছে তাদের সকলকারই দেহে এই সভ্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। পুরুষদের মাথার সামনের দিকটা কামানো, পিছনে প্রকাণ্ড ঝুঁটি—তাদের পরণে কাছাখোলা কাপড়, হাতাকাটা কামিজ গায়ে, কাঁধে একটা চাদর আর খালি পা, এইটাই তাদের নাকি জাতীয় পোষাক। যারা দরিদ্র তাদের কারো কারো খাটো চাদর এবং তাও যাদের সামর্থে কুলোয় না, তারা তার পরিবর্তে শুধু একটা তোয়ালে ব্যবহার করে। এ ছাড়া যারা একেবারে নিঃস্ব তাদের পরণে শুধু একটুক্রো নেংটি। প্রায় উলঙ্গই বলা চলে। অবশ্য সব দেশেই ধনী দরিদ্রের মধ্যে এই রকম একটা পার্থক্য আছে। তবে অন্যান্য দেশে ঠিক এতটা অভাব চোখে পড়ে না।

চিদম্বরম্ মন্দিরটি সবচেয়ে বিখ্যাত তার নটরাজ মূর্তির জন্যে।

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের দেবতা মহাদেবের নটরাজ নৃত্যের ভঙ্গিটি এত নিখুঁত ও এত সুন্দর যে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও এর দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান।

এর পরে গেলুম মাদুরা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে দ্বিতীয় বড় শহর। বেশ বড় ষ্টেশন এবং শহরের ভেতরেও খুব লোকজনের ভীড় ও কর্মব্যস্ততা। মাদ্রাজ ছেড়ে আসবার পর আর এ রকম স্থান দেখিনি। এতদিন অন্য যে সব স্থান ভ্রমণ করেছি তার প্রায় সবগুলিই গ্রাম—মন্দির আর তীর্থ ছাড়া বিশেষ কিছু সেখানে নেই, অথচ মাদুরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের যত নাম-ডাক, আসলে কিন্তু এর তীর্থ গৌরব তত বেশী নয়। প্রত্যেক মন্দিরের দেব দেবীর সম্বন্ধে বহু দৈব ব্যাপার সংশ্লিষ্ট থাকে, এখানে কিন্তু সে রকম কিছুই নেই, তবে হ্যাঁ, মন্দির যার নাম—দেখলে চোখ ফেরানো যায় না, এর কাছে অন্য সব মন্দিরের সৌন্দর্য যেন ম্লান হয়ে গেল। এর মত এমন বিরাট পাথরের তৈরী গোপুরম্ বা সিংহদ্বার ইতিপূর্বে আর দেখিনি। গোপুরম্ ওদিককার প্রায় সব মন্দিরেই আছে কিন্তু এরকম বিরাট অথচ এত নিখুঁত কারুকার্য আর কোথায়ও নেই। ওদিকের প্রত্যেক মন্দিরেই দেখা যায় একটা প্রাচীরের মধ্যে আর একটা প্রাচীর এবং এক একটি দরজা আর এই দুটি প্রাচীরের মধ্যস্থলে যে উন্মুক্ত চত্বর তাতে নানারকমের ব্যাপার থাকে। কিন্তু মীনাক্ষীর মন্দিরে ঢুকলে চক্ষু-স্থির হয়ে যায়। সেখানে যেন একটা বিরাট শহর। মন্দিরের প্রথম প্রাচীরটার মধ্যেই কত রকমের হাটবাজার দোকানপত্তর। শুধু দর্জির দোকানই হবে বোধ হয় দেড়শ'র কাছাকাছি। কাজেই এথেকে তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারো সমস্ত ব্যাপারটা কি বিরাট। এই মন্দির যেমন সবচেয়ে বড় তেমনি এর ঐশ্বর্যও সবচেয়ে বেশী, এর খুব নিকটেই সুন্দরেশ্বর শিবের

মন্দির। সুন্দরেশ্বরের অন্নময় রূপ একটি বিখ্যাত দর্শন। অর্থাৎ শিবলিঙ্গটির ওপর প্রচুর গরম ভাত ও ঘি ঢেলে দিয়ে পূজা আরতি প্রভৃতি হয়। অনেকটা আমাদের দেশের অন্নকূটের মত।

এখান থেকে গেলুম শ্রীরঙ্গম্। ত্রিচিনোপল্লী শহরের এক প্রান্তে এই বিরাট মন্দির। এর আয়তনও খুব বড়। কেবল মন্দিরের বাইরে যে দু'টি প্রাচীর তার মধ্যেই একটা গোটা গ্রাম। আর এই গ্রাম ও মন্দিরের জন্যেই এই রেল ষ্টেশনের সৃষ্টি। এই শহরটিতে সবশুদ্ধ চারটি রেল ষ্টেশন। শ্রীরঙ্গম্ নামে একটা খুব ছোট ষ্টেশন আছে বটে তবে তাতে বিশেষ যাত্রীর ভীড় হয় না। অধিকাংশ লোকই ত্রিচী কিংবা ত্রিচিনোপল্লী ষ্টেশনে নামে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের কারখানায় কাজ করে তারা নামে গোল্ডেন রক্ ষ্টেশনে।

ষ্টেশনের সীমানা ছাড়ালেই শহরের ঘর বাড়ী নজরে পড়ে। আর একটু দূর এগিয়ে গেলেই একটি প্রকাণ্ড তোরণ দেখা যায়। তার মধ্যে দিয়ে তবে শ্রীরঙ্গম্ পল্লীতে ঢুকতে হয়। এই তোরণ এবং প্রাচীর শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরেই প্রথম তোরণ এবং প্রাচীর। এর মধ্যে বাজার হাট, শহর, চওড়া চওড়া সব রাস্তা। এই থেকেই তোমরা অনায়াসে ধারণা করতে পারো এই সব মন্দিরের আয়তন কি রকম। এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আর একটা তোরণ পাওয়া যায়, সেটা পার হলে তবে মন্দিরের প্রধান গোপুরম্। এই গোপুরম্ দেখলে সহজেই বোঝা যায় কি বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে এগুলি তৈরী করতে। এগারো বারো তলা সমান উঁচু পাথরের সৌধ এবং তার প্রতিটি অংশ অপূর্ব কারুকার্য খচিত। এই রকম আরো তিনটে গোপুরম্ পেরিয়ে তবে মন্দিরে ঢুকতে হয়। রঙ্গজীর বিরাট অনন্ত শয়ন বিষ্ণুমূর্তি। যেমন প্রাচীন মন্দির তেমনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী এর দেবতা।

ওখানকার লোকেরা বলে এই মন্দিরটি নাকি নবম শতাব্দীতে তৈরী অর্থাৎ বারোশ' বছরের। এই দীর্ঘদিন ধরে তিলতিল ক'রে যে ঐশ্বর্য জমে উঠেছে তাকে কুবেরের ভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হয় না। মণি মাণিক্য হীরা জহরতের যেন ছড়াছড়ি। এ ছাড়া সোনারূপা যে কত, তার হিসাব কে রাখে। এ মন্দিরটি সকল দিক থেকেই মূল্যবান। এর ধন-দৌলতের পরিমাণ যেমন কল্পনাতীত, এর স্থাপত্য গৌরব তেমনি বিপুল। উপরন্তু এর দেওয়াল ও ছাদের গায়ে অজন্তার ধরণে একদিন যে বহু ছবি চিত্রিত ছিল তার চিহ্ন ম্লান হ'লেও এখনও কিছু কিছু বর্তমান।

ত্রিচিনোপল্লী শহরটিও বেশ। এর ঠিক মধ্যস্থলে এক দুর্গম পাহাড়ের চূড়ার ওপর ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। ওই উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের ওপর এরকম সুদৃঢ় দুর্গ কি করে তৈরী হলো ভাবতে গেলে যেন মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। মানুষের বুদ্ধি কল্পনার ও স্থাপত্য শিল্পের একত্র সমাবেশ! কাবেরী স্নান এখানের আর একটি পুণ্যকর্ম। কাবেরী নদী এই মন্দিরটিকে দু'ভাগে যেন ঘিরে আছে। এখানে কাবেরীর জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নির্মল।

এখান থেকে তাঞ্জোর যাওয়ার খুব সুবিধা। রাত্রের গাড়ী ধরে সকালেই পৌঁছান যায়। তাঞ্জোরের দেবতা শিবলিঙ্গ। এই শিব মন্দিরটি দেখতে অনেকটা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত। এরপর আমরা গেলুম সেতুবন্ধ রামেশ্বর। হিন্দুর চারটি প্রধান তীর্থের এটি অন্যতম। চারধামের একধাম এই সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্‌। হিন্দুদের বড় পবিত্র স্থান। ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করবার সময় যখন সেতু বাঁধেন তখন নাকি সকলের আগে এখানে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেন। অনেকের মনের বিশ্বাস যে, বহুজন্মের পুণ্যফলে তবে এই শিবলিঙ্গের দর্শন মানুষের ভাগ্যে মেলে।

বহুদিন থেকে তাই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল এই স্থানে যাওয়ার। এতদিন পরে তাই পম্বন জংশনের কাছে ট্রেন এসে পৌঁছতেই বুকের মধ্যে যেন কিসের একটা আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠলো। তার ওপর এই পম্বন ষ্টেশনে যেতে হলে সমুদ্রের ওপর খানিকটা পথ একটা রেলের দীর্ঘ পুল পেরিয়ে যেতে হয়। এটুকু পথ ভারী সুন্দর।

সেতুবন্ধ একটি তিনকোণা দ্বীপের ওপর। এই দ্বীপটির এক কোণে পম্বন, এক কোণে রামেশ্বরম্। আর এক কোণে ধনুষ্কোডি। ধনুষ্কোডি একটি বড় বন্দর। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে এবং সবচেয়ে সিংহল যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে ট্রেনগুলি সোজা ধনুষ্কোডিতে যায়। কাজেই রামেশ্বর যেতে হলে এই পম্বন ষ্টেশনে এসে গাড়ী বদল করতে হয়। ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রামেশ্বরম্ মন্দিরের গোপুরম্‌গুলো মাদুরা বা শ্রীরঙ্গম মন্দিরের মত খুব উঁচু নয়। তবে এর আয়তন প্রকাণ্ড। একবার সমস্ত মন্দিরটা সব ঘুরে দেখতে হলে পাকা তিন মাইল পথ হাঁটতে হয়। এই বিরাট মন্দিরটিকে আলোকিত করার জন্যে এর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ডায়নামো আছে। তবু রাত্রে মন্দিরের ভিতরটা যেন কেমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

এই সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ বা দালান অতিক্রম করলে তবে মন্দিরের প্রধান তোরণ। এই দীর্ঘ পথ প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকেই অতিক্রম করতে হয়। যেমন প্রশস্ত মন্দির, তেমনি তার অগণিত চত্বর ও তোরণ। এ ছাড়া চব্বিশটি কুণ্ডও আছে এর মধ্যে। দক্ষিণের সব বড় বড় মন্দিরেই একটা ক'রে সোনার ঘণ্টা স্তম্ভ থাকে। এখানে তেমনি ছিল তবে আয়তনে অন্যের তুলনায় ছোট। এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের বাহনের একটি বিরাট পাথরের মূর্তি আছে। যেন একখানা আস্ত পাহাড় কেটে তৈরী, দেখলে ভয় করে।

মূল মন্দিরের মধ্যে ঢুকে অনেকটা পথ অন্ধকার এবং তারি শেষ প্রান্তে এই অনাদি লিঙ্গ শিব, তাই পাছে দর্শনের অসুবিধা হয় এইজন্য শিবলিঙ্গের পিছন দিকে অসংখ্য দীপাবলীর ব্যবস্থা আছে। যেন একটা আলোর চালচিত্র—তার সামনে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র পূজিত চন্দ্র শেখরের উজ্জ্বল মূর্তি দেখে ভক্তিতে মাথা আপনি নিচু হয়ে গেল। তখন দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে বলে উঠলুম "জয় বাবা অনাদি লিঙ্গের জয়।"